উপসংহার

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

প্রকাশক—গ্রন্থকার
পোঃ লাভপুর, চিতুরা ; বীরভূম

জন্মাষ্টমী
১৩৪৬

মূল্য এক টাকা

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বীরভূমের প্রবীণ সাহিত্যিক

পরম শ্রদ্ধেয়

রায় শ্রীযুত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

নাট্যবিদ্যাভারতী এম. বি. ই

মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে—

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারার ইতিহাস অভিনব এবং বিচিত্র। প্রাচীনকালে আমাদের ছোট গল্প একেবারে ছিল না তাহা নয়; কথাসরিৎসাগর জাতকের গল্পের দাবী বাদ দিয়াও, আমাদের ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমায়ের ঝুলির ভিতরকার উপকথার কথা বলা চলে। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা ছোট গল্প তাহারই ক্রম-অভিব্যক্তি নয়। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতেই উপন্যাস রচনা করিতে বসিয়া রাধারাণী যুগলাঙ্গুরীয়কে বড় গল্প রচনা করিয়া ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের রসকমণ্ডলু হইতে এই ধারাকে আনিয়া বাংলার বুকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সে স্রোতের বেগে আজ আমাদের কথা সরিৎসাগর জাতক উপকথা প্রভৃতি ধারার মজা মুখ খুলিয়া গিয়া প্রধান স্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, এই ধারার প্রধান বিশেষত্ব ইহার অব্যাহত গতি, ক্রম-প্রসরমান পরিধি এবং ক্রম-বর্দ্ধমান গভীরত্ব।

রবীন্দ্রনাথ যাহা সৃষ্টি করিলেন, তাহার স্রোত রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে বিলুপ্ত হয় নাই, সে স্রোত ক্রমশঃ চলিয়াছে—শক্তির গতিবেগে মুখর হইয়া চলিয়াছে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শরতোত্তর সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রাধান্য। এটা যেন ছোট গল্পেরই যুগ। এ-যুগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ শক্তিশালী গল্পলেখকগণ যে সকল গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ধারাকে এতটুকু খর্ব্ব করে নাই; এবং পরাধীন দেশের সাহিত্য না হইলে বিশ্ব সাহিত্যের ছোট গল্পের আসরে বাংলা গল্প বিশিষ্ট আসন লাভ করিত—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প গৌরবের বস্তু। সেই হেতু সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসুক নবীন পূজারী দলের মধ্যে অধিকাংশই গল্প-লেখক-যশ-প্রার্থী। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত পাঠকের এই খানি-ই প্রথম গল্পের বই হইলেও তিনি নবীন-গল্প-লেখক-যশ-প্রার্থী নন; অনেক দিন হইতেই 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় গল্প লিখিয়া আসিতেছেন। প্রচুর লিখিবার অবসর তাঁহার হয় নাই—তাই বোধ করি, যাহাকে বলে storm—সেই storm এর সৃষ্টি করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি আগে দেখিয়াছেন; পল্লীতে তাঁহার বাস; তাই পল্লীই তাঁহার গল্পের পটভূমি; মানুষগুলিও খাঁটি মাটির মানুষ, তাহাদের বেদনা-দুঃখ আনন্দ-সুখ নিজে সর্ব্বাগ্রে প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছেন, পরে লিখিয়াছেন। পাঠক এবং সমালোচক এ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট, ভূমিকা লেখকের ভাগ্যে উকীল অপবাদ-ই লাভ হইয়া থাকে, তাই কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষ করিয়া আমি উল্লেখ করিব না। পাঠক সমালোচক এবং সকল বিচারকের প্রধান বিচারক কালের দরবারে আমি তাঁহার এই সাধনার আর্জ্জি দাখিল করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি বলিব যে, কমলাকান্ত সত্য-শিব-সুন্দরকে উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি এই সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহার-ই সূচনা তাঁহার 'উপসংহারে' সুপরিস্ফুট।

লাভপুর, বীরভূম। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিঋণ

ভদ্র ও ইতর

ব্যথার উপহার

রাজা প্রজা

কালো

মমতা

দুর্দান্ত জমিদার

জয় পরাজয়

উপসংহার

উপসংহার

মুক্তিঋণ

মাষ্টার মশায়ের বাড়ী গ্রামের এক প্রান্তে। চির জীবনটা শিক্ষকতা করিয়া তিনি 'মাষ্টার মশায়' নামটি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম লোকে ভুলিয়াই গিয়াছে; আধুনিকেরা তো জানেই না। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম্য মহাজন এক অশুভক্ষণে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে মাষ্টার মশায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপর, যাহা হইয়া থাকে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী জব্দ করিবার যতগুলি প্রচলিত-অপ্রচলিত প্রণালী মহাজনের জানা ছিল, সবগুলিই একে একে প্রয়োগ করিয়া, আজ মাষ্টার মশায়ের উপর তাঁহার কল্পিত শত্রুতার প্রতিশোধ তুলিয়াছেন। মাষ্টার মশায় পথে বসিয়াছেন।

মাষ্টার মশায়ের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বাংলা ও বিহারের বড় বড় ইস্কুলে মাষ্টারী করিয়া পৈতৃক লক্ষ্মীশ্রী কিছু বাড়াইয়াছিলেনও। গ্রামের দরিদ্রেরা তাঁহার অর্জ্জিত অর্থের একটা অংশও লাভ করিত। সুতরাং, গ্রামে তাঁহার একটু খাতির-প্রতিপত্তি হইয়াছিল বৈকি। আর এই জন্যই তিনি পড়িয়াছিলেন কূটচক্রী মহাজনের কোপে।

বর্ত্তমানে মাষ্টার মশায়ের সংসার বলিতে তিনি এবং তাঁহার বৎসর পাঁচ বয়সের একটি নাতি। তাঁহার একমাত্র প্রিয় পুত্র এবং মমতাময়ী পুত্র-বধূ গত বৎসর এই শিশুটির ভার বৃদ্ধের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া

এ জগতের সঙ্গে হিসাব চুকাইয়াছে। গৃহিণী আগেই বিদায় লইয়াছেন। বৃদ্ধের ব্যথিত স্নেহের একমাত্র উত্তরাধিকারী এই শিশু। মাষ্টার মশায় বলেন—'আমার স্নেহের রাজ্যে যত ক্ষতি হয়েছে সব ভ'রে দিয়েছে আমার এই ভাইটি'। দুঃখ-শোকের নির্ম্মম আঘাতে ভগ্নপঞ্জর বৃদ্ধের এখন আর এই ভাইটির জন্য মরিতেও ইচ্ছা হয় না; দিবারাত্রি মুখে লাগিয়াই আছে 'ভাইটি'। যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া যে বৃদ্ধ পাইয়াছে এই ভাইটিকে!

কলিকাতায় এক ইস্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময়ে মাষ্টারমশায়ের ছাত্র ছিল প্রেমেন্দ্র। এখন প্রেমেন্দ্র জজ হইয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাস, প্রিয় ছাত্র প্রেমেন্দ্রের হাত দিয়াই ভগবান্ বৃদ্ধের নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের এক 'রায়' বাহির করিলেন!

প্রেমেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া বিষণ্নমুখে পত্নী প্রীতিকে বলিল—আজ একটা দারুণ রায় দিয়ে এলাম প্রীতি। এক দেব-হৃদয় বৃদ্ধের গাছের তলা,—আর এক মহাজনের অন্যায্য লাভ!

প্রীতি বলিল—অমন 'রায়' দিলে কেন? আর কর্ত্তব্যের খাতিরে দিলেই যদি, তবে মন খারাপ করছো কেন?

প্রেমেন্দ্র বলিল—মন খারাপ করতাম না, প্রীতি, এই তো আমাদের ক'রতে হয়! তবে বৃদ্ধ আমার এককালের শিক্ষক; এবং আজো তাঁকে আমি সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকি। প্রমাণের বলে চক্রী মহাজন ডিক্রী আদায় ক'রে নিয়েছে। বৃদ্ধের মন্তব্য শুনবে? আদালত থেকে ফিরবার মুখে শুনতে পেলাম, বৃদ্ধ কারে যেন ব'লছেন "হাঁ, জজ সাহেব, আমার ছাত্র প্রেমেন্দ্র ছাড়া আর কেউ নয়।

মামলায় ও তরফে যা' প্রমাণ, তা'তে ঠিক এ ছাড়া অন্য রায় দেওয়া অসম্ভব। দেখ, প্রাণগোপাল বাড়ুয্যে সম্পত্তির থাকা কি যাওয়া নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামা'তে অভ্যস্ত নয়! এ ব্যাপারে মনের দিক্ থেকে আমার যা' লোকসান হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণ ক'রেছে আমার ছাত্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। শিক্ষকের কাছে এ লাভ যে কত বড়,—কত গৌরবের, তা' তো তোমরা বুঝবেনা!" এই সময়ে আমি একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম; বাস্তবিকই একটা তৃপ্তিরেখা তাঁর বিষণ্ণ মুখটার উপর ভেসে উঠেছিল। প্রাণটা আরও কেঁদে উঠ্‌লো প্রীতি, বৃদ্ধের বক্ষঃপুটে জড়ানো একটি শিশুকে দেখে। তাঁকে আদালতে আসতে হয়েছে,—তাও শিশুটিকে কোলে করে নিয়ে! বেশ বোঝা যায়, শিশুর আপন বলতে বৃদ্ধ ছাড়া জগতে আর কেউ নাই।

প্রীতি নির্ব্বাক্ গাম্ভীর্য্যে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গেল; একটিও কথা বলিলনা। প্রেমেন্দ্রেরও হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল; সে প্রীতির ভাবান্তরে কৌতূহলী হইল না।

গ্রামে মস্ত বড় একটা সোর গোল,—মাষ্টার মশায় নাকি মামলার আপীল করিয়াছেন হাইকোর্টে। বৃদ্ধ, 'ভাইটি'কে লইয়া খেলা করেন, বাহিরের দরজার পাশে। পাশ দিয়া যাইবার সময় 'প্রাতঃ পেন্নাম' করিয়া গ্রামের লোক জানাইয়া যায়, আপীল করিয়া মাষ্টার মশায় খুব ভাল কাজই করিয়াছেন। হয় তো, ইহা তাহাদের প্রাণের কথা। কিন্তু মাষ্টার মশায় ভাবেন পরিহাস। শুধু গম্ভীর হইয়া বলেন "হুঁ"।

—অদৃষ্টের পরিহাস! সর্ব্বহারা পরপারের যাত্রী বৃদ্ধ আমি। কারও অনিষ্ট কখনও করি নাই। আর, এ বয়সে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে

কারও কোন অহিত করতে পারি, এ আশঙ্কার কোন অবকাশও কারও মনে দিই নাই। তবে, কেন গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে যায়—আমি নাকি হাইকোর্টে আপীল ক'রেছি !—

বৃদ্ধ ভাবে, শুধু ভাবিয়াই যায়। নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার বিশেষ কিছু নাই ; পাড়ি প্রায় সমাপ্তির মুখে। কিন্তু তাঁহার করুণ স্নেহের গঙ্গাজলে নিত্যবিধৌত এই শিশুটির ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেও তাঁহার হৃদয় দুঃখে, বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়ে ; অধীর বালকের মত বৃদ্ধের চোখ ফাটিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় জল গড়াইয়া আসে।

বাহিরে বসিয়া বসিয়া মাষ্টার মশায় তামাক টানেন ; ভাইটি দেয় বৃদ্ধের হুঁকার মুখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া। হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া ভাইটির মুখের পানে তাকাইতেই তাঁহার সব চিন্তা, সমস্ত গাম্ভীর্য্য কোথায় ভাসিয়া যায় ; সস্নেহে বলিয়া উঠেন—ভাই, ভাই, ভাইটি আমার। ভাইটি খেলা করে, বৃদ্ধ আন্‌মনা হন ; আবার চিন্তায় চিত্ত আকুল হইয়া পড়ে, ললাটের রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। শিশু খেলিতে খেলিতে চোখের আড়াল হয় ; বৃদ্ধ ত্রস্তকণ্ঠে ডাকেন—ভাইটি, ভাইটি ! চারিদিকে শঙ্কিত অনুসন্ধান সুরু হইয়া যায়। দরজার পাশেই ভিতরের দিকে ভাইটিকে দেখিয়া, দীর্ঘ প্রবাসীর প্রিয়জন-দর্শনের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বৃদ্ধ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন।

সন্ধ্যাহ্নিকে বসেন ভাইটিকে কাছে লইয়া। কোশাকুশি উল্‌টাইয়া গঙ্গাজল ফেলিয়া শিশু একাকার করে ; বৃদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাই, ভাই,' বলিয়া সেগুলি আবার গুছাইয়া লইয়া অর্দ্ধপঠিত মন্ত্র সমাপ্ত করেন। 'ভাইটি' তাঁহার পিঠের উপর পড়িয়া দু'কাঁধে দু'হাত রাখিয়া দুলিতে থাকে, বৃদ্ধ সন্ধ্যা করেন। একটু সরিয়া গিয়া খেলিতে

থাকে, বৃদ্ধ সন্ধ্যা করিতে করিতেই চারি দিকে চাহিয়া ডাকিতে থাকেন—ভাই, ভাই, ভাইটি !

আজীবন ভগবদ্‌ভক্ত মাষ্টার মশায় আজ ভগবান্ ভুলিয়াছেন ! নাতিটি হইয়াছে তাঁহার ইহামুত্রের সর্ব্বস্ব।

মাষ্টার মশায় অসুখে পড়িয়াছেন। প্রথমে তিন চার দিন চাট্টি চাট্টি রাঁধিয়া ভাইটীকে খাওয়াইতেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার অসুখ বাড়িতে লাগিল। আর ভাইটাকে খাওয়ানো-নাওয়ানোর তাগদ থাকিল না। প্রতিবেশী একজনকে ডাকিয়া বৃদ্ধ সজল চোখে তাহার হাত দুটি ধরিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—যে কয় দিন ভাল না হই, ভাইটিকে দুটি খেতে দিও ভাই, জ্বরটা একটু ক'মে এলে আমি নিজেই দেখ্‌ব।' প্রতিবেশী সম্মত হইল।

বৃদ্ধ জ্বরে বেহুঁস, সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই। ভাইটি কাঁদে—"দাদু ভাত খাব, দাদু ভাত খাব" ; সাড়া পায়না। বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদে "দাদু, দাদু খিদে পেয়েচে"; দাদু সাড়া দেন না। বৃদ্ধের তাপদগ্ধ শুষ্ক ওষ্ঠে কচি ঠোঁট দুটি রাখিয়া শিশু কাঁদে—"দাদু, দাদুমণি, ভাত দাও !" কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত ভাইটি দাদুর পাশে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। হায় রে, হতভাগ্য শিশু !

দয়াপরবশ হইয়া কেহ লইতে আসিলে খোকা তার দাদুর বক্ষঃপুট ছাড়িয়া উঠে না। সে কারও কাছে যাইবে না তার দাদুকে ছাড়িয়া। আরও দু'একদিন যায় ; সে আর 'খাব খাব' বলিয়া কাঁদে না। দরদী কেউ খাওয়াইয়া দিলে দু'এক গ্রাস খায়, কিন্তু সে আর ঘুণাক্ষরেও জানায় না যে তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। হা রে, কাঙালের ঘরের শিশু, তুইও এই বয়সে দুঃখের চাপে সাবধান হইয়া গিয়াছিস !

বৃদ্ধের অসুখ বাড়িয়াই চলে। চিকিৎসা নাই, শুশ্রূষা নাই। প্রতিবেশীরা কেউ আসিয়া এক-আধটু জল বৃদ্ধের জ্বরশুষ্ককণ্ঠে দিয়া যায়; খোকাকে খাবার সময় কিছু খাওয়াইয়া যায়। খোকা খেলা করে,—দাদুর কাছে বসে,—কপালে হাত দেয়,—ডাকে, 'দাদু, দাদু',—কাঁদে, আবার চুপ করে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত অশ্রুঝরণ দু'কানের পাশ দিয়া বহিয়া বালিস ভিজায়।

চৈত্রের দুপুর। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। জ্বরের প্রদাহের উপর গ্রীষ্মের তাপ মাষ্টার মশায়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। কেউ কোথাও নাই। ক্ষীণকণ্ঠ হইতে অতি অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল, 'জল,—ভাইটি'। ভাইটি দাদুর মাথার পাশে বসিয়াই খেলিতেছিল। আজ কয়েক দিন পরে দাদুর মুখে কথা শুনিয়া শিশু ব্যস্তভাবে কাছে আসিয়া ডাকিল,—দাদু, জল দেবো! বৃদ্ধ ক্ষণেকের জন্য একবার চোখ তুলিয়া ভাইটির পানে চাহিলেন; তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। খোকা দেখে, প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে জলদিয়া যায় তা'র দাদুর মুখে; শিয়রের পাশে জলের গেলাস প্রতিবেশীরা কেহ রাখিয়া গিয়াছিল; সে গেলাসটি দু'হাতে ধরিয়া দাদুর মুখের কাছে আনিল।

—'দাদু, জল খাও।'

—'দাও খোকা, আমি দিচ্ছি।'

অপরিচিত মধুকণ্ঠের স্নেহমাখানো কথা কয়টি শিশুর অন্তর স্পর্শ করিল। তাহার হাতের গেলাস হাতেই রহিল; অপলক নেত্রে অপরিচিতা আগন্তুকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুকা মাষ্টার মশায়ের মাথার কাছে বসিয়া খোকার হাত হইতে জলের গেলাসটি

লইয়া খোকাকে কোলে বসাইয়া লইল; তারপর রোগীর কপালে মৃদু করস্পর্শ দিয়া ডাকিল—মাষ্টার মশায়।

এক সঙ্গে দেহমনের পুণ্যরসায়ন মৃদুস্পর্শ ও স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর বৃদ্ধকে অপার্থিব তৃপ্তি দিল। জ্বরের যন্ত্রণা যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল তৃপ্তির আরামে বৃদ্ধের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—মা!

—মাষ্টার মশায়!

আস্তে আস্তে বৃদ্ধ চোখ খুলিলেন। তাঁহার চোখ দুটি যেন আগন্তুকার মুখের উপর আটকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে যেন চিনিলেন।

—মা, প্রীতি! আমি কি ঠিক চিনেছি, মা!

বৃদ্ধের চোখ মুদিয়া আসিল। নেত্রপ্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু টলটল করিয়া উঠিল।

—হাঁ, মাষ্টার মশায়, আমি প্রীতি। জল খাবেন!

বৃদ্ধ হাঁ করিলেন। প্রীতি জল দিয়া আঁচলে তাঁহার রোগশীর্ণ মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কপালে মাথায় আঙুল বুলাইতে লাগিল। পাশে উঠানে প্রীতির ঝি দাঁড়াইয়াছিল। প্রীতি বলিল—ঝি, ড্রাইভারকে ডাক তো।

বাহিরে মোটর লইয়া ড্রাইভার অপেক্ষা করিতেছিল।

ড্রাইভার আসিলে প্রীতি একখানা স্লিপ লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—শীগ্গি মোটর নিয়ে সদরে যাও। জজ সাহেবকে এই স্লিপটা দিও।

মাষ্টার মশায়ের গ্রাম হইতে সদর মাইল ছয়ের মধ্যে। বৈকালে গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিল—জজ সাহেব, ডাক্তার সাহেব দু'জনে মোটর হইতে নামিয়া মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রেমেন্দ্র বারান্দার নীচে পা ঝুলাইয়া মাষ্টার মশায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া পায়ে হাত দিয়া ডাকিল—মাষ্টার মশায়!

মাষ্টার মশায় চাহিলেন; তাঁহার যেন মনে হইল, প্রেমেন্দ্র। চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আবার চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ পরে চোখ দুটোকে জোর করিয়া বড় করিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর, প্রীতির উদ্দেশ্যে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—আমি কি ঠিক দেখ্‌ছি মা! ওখানে কি প্রেমেন, জজ সাহেব!

প্রীতি জানাইল, তিনি ঠিক-ই চিনিয়াছেন।

মাষ্টার মশায় বলিলেন—মা, তুমি একবার উঠে ভিতরে বসো তো, প্রেমেন এসে একবার আমার মাথার কাছে বসুক।

মাষ্টার মশায় জানেন না—প্রেমেন প্রীতির কে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাষ্টার মশায় যখন পাটনায় ছিলেন, তখন পাটনার এক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারের দুহিতা প্রীতি ছিল তাঁহার ছাত্রী। মাষ্টার মশায় প্রীতিকে বৈষ্ণব দর্শন পড়াইতেন। এই পরম ভাগবত মাষ্টার মশায়ের মুখে ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে প্রীতির মন সংসারের ধূলামাটি ছাড়িয়া কোন আলোকের রাজ্যে ছুটিয়া যাইত। সে মুগ্ধ হইয়া, অবাক্ হইয়া শুনিত, কেবল শুনিয়াই যাইত। এক আনন্দ সংপ্লবে লীন হইয়া সে নিজেকে ভুলিত, বক্তাকে ভুলিত, দেশকাল সব বিস্মৃত হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি খেতাবের অধিকারিণী হইলেও, বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রীতির ছিল অকুণ্ঠ অনুরাগ।

মাষ্টারমশায় কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দেশে আসিলেন। তারপর হইতে প্রীতিদের কোন খোঁজ তিনি রাখিতে পারেন নাই। কালের নির্ম্মম কশাঘাতে তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। ব্যথাহত বৃদ্ধ নিজেকে লইয়াই নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রেমেন্দ্রের সহিত প্রীতির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রেমেন্দ্র জজ হইয়াছে।

প্রেমেন্দ্রও একটা ধাঁধায় পড়িয়াছে। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে প্রীতির এত আত্মীয়তা, তাহাকে কিছু না বলিয়া প্রীতির একাই এখানে চলিয়া আসা, এসব ব্যাপার তাহার কাছে রীতিমত একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রীতি মাষ্টারমশয়কে বলিল—ডাক্তার সাহেব একবার আপনাকে দেখুন, তারপর জজসাহেবের সঙ্গে আলাপ করবেন।

বৃদ্ধের মুখে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

—ডাক্তার ডেকেছ, প্রীতি! আর কেন মা, আমার খেয়া শেষ হ'য়ে এসেছে; এমন সময়ে আর টানাটানি ক'রো না মা। যদি পার, আমার ভাইটিকে—' কান্নায় বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রীতির কোলের কাছেই খোকা বসিয়াছিল। তার কচি একখানি হাত নিজের শীর্ণ হাতে তুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—আর দু'চার বছর দুমুঠো খেতে দিয়ে পালন করো মা, তারপব, তোমারি ঘরের চাকর-বাকর ক'রে ওকে রেখে দিও প্রীতি!

প্রীতির মাতৃহৃদয়টা মোচড় দিয়া উঠিল। কান্না চাপিতে চেষ্টা করিলেও কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত কাতরানি বাহির হইয়া আসিল। প্রেমেনের চোখও অসিক্ত ছিল না। বুঝি ডাক্তার সাহেবের হৃদয়ও গলিয়াছিল! প্রীতি আঁচলে বৃদ্ধের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—না মাষ্টার মশায়, আপনাকে বাঁচ্‌তে হবে। আর আপনার 'ভাইটি'র খাবার ভাবনা নাই। এই দেখুন 'তার'; হাইকোর্ট আপনার অনুকূলে মামলা ডিক্রী দিয়েছেন।

মাষ্টার মশায় স্থির দৃষ্টিতে প্রীতির মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

—আমার মাম্‌লা! আমি তো হাইকোর্টে কোন মামলা করি নাই; মা!

—আপনি করেন নাই, আমি ক'রেছিলাম।

প্রেমেন্দ্রের বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—তুমি করেছিলে!

প্রীতি ধীরভাবে বলিল—হাঁ, আমিই ক'রেছিলাম। তোমার মুখে মামলার ব্যাপার শুনে আমি খোঁজ নিয়ে জানি, এই মামলায় যাঁর সর্ব্বনাশ হয়েছে, তিনি শুধু তোমার একার নয়,—আমারও মাষ্টার মশায়। জজ তুমি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেছ। আমার কর্ত্তব্য তো তোমার থেকে পৃথক্। দাদা করেন ক'লকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্, তাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে আপীল করতে বলে দিলাম। অনুরোধ জানালাম—এ মামলায় যে আমার কোন সংশ্রব আছে, একথা যেন কেউ জানতে না পারে। না হ'লে, জজ সাহেব দিয়েছেন রায়, আর, তার আপীল ক'রছে তাঁর স্ত্রী। ব্যাপারটা নিয়ে দেশময় একটা হৈ চৈ প'ড়ে যাবে; বিশেষ ক'রে সাময়িক কাগজগুলি তো উগ্র মাতনে মেতে উঠ্‌বে। সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত ক'রে মামলা ফেরানো হয়েছে। আজ তুমি যখন কোর্টে, তখন দাদার 'তার' পেলাম, আমার পক্ষেই মামলার ডিক্রী হয়েছে। মাষ্টারমশায়ের খোঁজ প্রতিদিন রাখছিলাম। তাঁর এই শঙ্কাজনক অবস্থায় আমি বড় উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলাম। 'তার' পেয়েই আর দেরী করতে পারি নাই, আসবার আগে তোমাকে জানাতেও পারি নাই।

—দেখুন, ডাক্তার সাহেব!

—আবার দেখাবে মা, দেখাও। এখন আর এই চাঁদের হাট ফেলে

আমার মর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না, প্রীতি! কিন্তু মা, দেখানো বৃথা, সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

একটু থামিয়া শ্রান্ত, স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন-- তুই তো নিজের ঋণ শোধ কর্‌লি মা, কিন্তু, এই সংসারের দায় থেকে আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে আমার ঘাড়ে নূতন করে' যে ঋণের দায় চাপিয়ে দিলি,—সেই মুক্তিঋণ শোধ ক'রতে আমার যে জন্ম জন্ম কেটে যাবে মা!

শ্রমে বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার সাহেব দেখিলেন। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। প্রেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। বৃদ্ধের এ জ্ঞান, নিভিবার পূর্ব্বে দীপের ঔজ্জ্বল্যের মত।

অবস্থা অতি দ্রুত খারাপের দিকে চলিল। সকলেই বুঝিল, আর দেরী নাই। জড়িতস্বরে বৃদ্ধ উচ্চারণ করিল—মা, প্রীতি,—প্রেমেন, —ভাইটি! প্রীতি বৃদ্ধের মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া সজলনেত্রে কম্প্রকণ্ঠে তারক ব্রহ্ম নাম শুনাইল,—মুখে দুধ গঙ্গাজল দিল। মাষ্টার মশায়ের সকল দুঃখের অবসান হইল।

চোখের জলে প্রেমেন্দ্রের বুক ভাসিতে লাগিল। দীনকণ্ঠে বলিল— প্রীতি, আমি-ই মাষ্টারমশায়ের মৃত্যুর হেতু!

প্রেমেন্দ্র মুখাগ্নি করিয়া সযত্নে শব সৎকার করিয়াছে। মাথা মুড়াইয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছে মাষ্টারমশায়ের ভিটায়। প্রীতি মাষ্টার-মশায়ের ভাইটির সব ভার লইয়াছে; সে এখন প্রীতির কাছে পুত্রস্নেহ আদায় করিতেছে।

ভদ্র ও ইতর

কম্পিত-করে গহনার ছোট মোড়কটি মহাজন বিপুল বাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া, অনুপম মাতালের মত টলিতে টলিতে পাক খাইয়া পড়িয়া গেল সদর দরজার পাশে। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কথা নাই; কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ। মুখটায় মর্ম্মন্তুদ ব্যথার সুস্পষ্ট ছাপ। চোখ দুইটা দিয়া রক্ত যেন ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহে। গহনা পরীক্ষায় ব্যস্ত মহাজনের মুখের উপর একবার শক্ত দৃষ্টি হানিয়া, পর মুহূর্ত্তেই দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'হায়, মা!' তারপর লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়িল মাটিতে লুটাইয়া।

মিনতি ভিতর হইতে স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কুলবধূর সঙ্কোচ ভুলিয়া ত্রস্তবসনা, বিক্ষিপ্তকুন্তলা মিনতি আজ বাহিরের লোকের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত স্বামীর মূর্চ্ছা অপনোদিত করিয়া ধীরে ধীরে ধরিয়া ভিতরে আনিল। বারান্দায় একখানা মাদুর পাতাই ছিল; সন্তর্পণে অনুপমকে মাদুরের উপর শোওয়াইয়া দিয়া তার মাথাটা কোলে লইয়া বসিল।

শুনিতে পাওয়া গেল—বাহিরে বিপুলবাবু তাঁহার স্বভাব-বিরস কণ্ঠে মহাজনের গর্ব্ব মাখাইয়া বলিতেছেন—অভিনয়ের ভঙ্গীতে দেওয়া ত' হ'লো গয়না দু'খানা! এ সোনা কি পিতল চেনা দায়। এতে দাবীর সামান্য অংশ মাত্র পরিশোধ হ'তে পারে। স্যাক্‌রা দিয়ে গালিয়ে যা' ন্যায্য দাম হয়, বাকীতে উশুল দিয়ে নেবো। কিন্তু বাকীটা শীঘ্রি যাতে শোধ হয়, তার চেষ্টা না দেখ্‌লে, বাধ্য হয়েই আবার অপ্রিয় হ'তে হ'বে আমায়।

—টাকা শোধ দিতে হ'লে এমন মূর্চ্ছার অভিনয় সবাই ক'রে থাকে—এই সাধারণ মন্তব্যটুকু করিতে গিয়া আদালতের পেয়াদাপ্রবরও এমন কয়েকটা অবান্তর কটু কথা মিশাইয়া বসিল, যাহা নিতান্ত অশ্রাব্য ও অকথ্য, এবং যে কোন প্রশান্তচিত্তে ক্রোধোদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট।

অনুপমের ধৃষ্টতার শাস্তি দেখিতে সমাগত গ্রামবাসিগণের মুখও সমালোচনার স্পষ্টভাষণে বিরত ছিল না। মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে কেহ কেহ উদ্দেশ্যে শুনাইয়া গেল—কোমরের বল যার এত কম, তার উচিত পায়ে হাতে ধ'রে একটা রফা ক'রে নেওয়া; তাতে প্রয়োজন হ'লে আমরাও সাহায্য ক'রতে পারি।

অনুপমের চোখে আজ অশ্রুর অবাধ প্লাবন। মিনতির ধৈর্য্যের বাঁধ আগেই ভাঙ্গিয়াছিল; তাহার চোখের ঝর্ণাধারা অনুপমের উচ্ছল অশ্রু-স্রোতে মিশিয়া যে কারুণ্যপ্রবাহ সৃজন করিল, তাহা পাষাণ হৃদয়েও প্লাবন অনিতে সমর্থ।

বীরভূমের একটি ছোট পল্লী মাণিক-চক। ঘর ত্রিশ লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলেরই উপজীবিকা চাষ। চৈত্র মাসের মধ্যেই সকলের ঘরের ধান ফুরাইয়া যায়; আবার বৈশাখ হইতেই বস্তা কাঁধে করিয়া তাহাদিগকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়।

একাধারে মহাজন ও পত্তনিদার বিপুল চাটুয্যের মৌখিক আত্মীয়তার ফাঁদে ধরা পড়ে না, এমন লোক তো দেখিলাম না। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক্—সাক্ষাৎ হইলে পরম আদরে বসাইয়া আত্মীয়তাপূর্ণ প্রশংসাবাদের বিপুল প্লাবনে একেবারে স্বর্গের সিংহ-দ্বারের কাছাকাছি লইয়া যান ভাসাইয়া, আর যেমন পিছন ফেরা, অমনি

অভদ্র ভাষায় গালাগালি, অবশ্য শুনাইয়া নহে। ইহাতে যে কি আনন্দ, তা' তিনিই জানেন।

মহাজন ভালো; তাগাদা নাই। খাতক নিশ্চিন্ত। দেনার টাকা সুদে আসলে খাতকের সম্পত্তির মূল্যের কাছাকাছি হইলেই, একেবারে আদালতের বটতলা। তারপর স্থাবর, অস্থাবর, সমস্ত সম্পত্তির মাথায় হাত বুলাইয়াও পরমদয়াল মহাজনপ্রবর বলেন—আহা, বেচারী সব শুধ্‌তে যখন পারলেই না, তখন আর কি করা যায়! মানুষ তো আমি চোখের পর্‌দা তো আছে! এই 'নাই নাস্তি'র দশা, তার উপর কি আর জুলুম করা যায়! আর আমি ছাড়া ওদের মুখ চাইতে আছেই বা কে? কাজেই ছেড়ে দিতে হ'লো অতগুলো টাকা, কি করি!'

কোন কাজেই পয়সা খরচ করিতে হয় না তাঁহাকে; প্রজারা নাকি তাঁহার 'খাতিরে' এম্‌নি-ই করিয়া দেয়! তামাক ইচ্ছা হইলেই বাবু শুধু ক'ল্‌কেটি খুলিয়া যাহাকে সম্মুখে পান, বলেন—তোদের তামাকটা বেশ কড়ামিঠে, রে! একবার আগুন ক'রে আন্‌দিকি। বেশ করে' তামাক-টামাক সেজে, বুঝ্‌লি! আমার তামাকটা, বাপু, এমন মেখেছে, ছ্যা!

বলা বাহুল্য, তামাকের 'পাট'-ই বাবুর ঘরে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, বাবু নাকি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ তৃতীয় বিবাহে খরচ করিয়াছিলেন, নগদ পাঁচটি সিকা। কথাটা রঙ্‌ফলানো মনে হইলেও, সত্যেরই কাছাকাছি।

লোকে একবাক্যে স্বীকার করিত—'মাণিকচকের বাঁড়ুজ্যে বংশ উজ্জ্বল ক'রেছে, অনুপম। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, মায়া, বিনয়—ভগবান্‌ যেন দু'হাতে ঢেলেছেন, ঐ একটা জায়গায়।'

গ্রামের লোকের দুরবস্থা অনুপমের বুকে বড় বেদনা দিত। সে একদিন গ্রামের চাষী যুবকদের ডাকাইয়া বলিল—একটা প্রস্তাব আমি ক'র্‌ছি তোদের কাছে। দেখ্' গ্রামের আবাদী জমি হাজার বিঘার উপর। পৌষ মাসে কাটা ধান আগ্‌লাবার জন্য জমিদার তরফ থেকে যে লোক বন্দোবস্ত আছে, তাকে দিতে হয় বিঘা প্রতি দু'আঁটি ধান সমেত খড়। অথচ, যে চুরির ভয়ে পাহারার বন্দোবস্ত, সেই চুরিই প্রতি বৎসর অবাধে হ'তে থাকে। আমি বলি কি—তোরা নিজে মাঠ পাহারার ভার নে। আমিও তোদের যথাশক্তি সাহায্য কর্‌বো। হিসাব ক'রে দেখেছি, বৎসরে জম্‌বে ত্রিশ বত্রিশ মণ ধান। বৎসর কয়েক পরে তোরা এই জমানো ধান থেকেই বর্ষাকালে আধা স্থদে ধার ক'র্‌তে পার্‌বি। ক্রমে ভাণ্ডার বড় হ'লে স্থদ দেবারও দরকার হবে না। দেখ্‌বি, কয়েক বৎসরের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফেঁপে উঠ্‌বে রে; বাস্তা বগলে ক'রে আর লোকের দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে হবে না।

তাহারা যেন পাথারে কূল পাইল! সকলে অনুপমের পরামর্শ-মত পাহারা আরম্ভ করিয়া দিল। মহাজন শুনিলেন। যুবকদের ডাকাইয়া একটু মৃদু রসায়ন প্রয়োগ করিলেন:—অবস্থা না হয় তোদের আজ খারাপই হয়েছে, কিন্তু ভদ্র বংশের ছেলে তো তোরা! ডোম হাড়ির মত মাঠ পাহারার কাজ ক'রে বাপ ঠাকুরদার মুখে আর কালি লেপিস্ ন। তারপর এই শীতকাল, মাঠের উৎকট ঠাণ্ডা! দিনের এই ভূতের খাটুনি, আর রাত্রেও ঘুমুবি না। শেষে অস্থখ বাধিয়ে বসবি! একমুঠো ধানের স্থসার কর্‌তে গিয়ে, দশটাকা ডাক্তারকে দিতে হবে; হুজুগে মাতিস্ না। —হায় রে! দেশটা হুজুগে হুজুগেই মাটি হ'য়ে গেল। মাতিয়েছে বুঝি, ঐ 'গাঁ-ভাঙ্গা' বাঁড়ুজ্যেদের চ্যাঙ্‌রাটা?

কিন্তু যুবকদের নবীন উৎসাহের স্রোতে বিপুলবাবুর 'অমায়িক আত্মীয়তা' 'কুটা'র মত ভাসিয়া গেল। সে বৎসর ধান হইয়াছিল ভালো। বেশ কিছু ধান যুবকদের ভাণ্ডারে জমিয়া গেল। বিপুলবাবু প্রমাদ গণিলেন। ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েক জনকে নাচাইলেন —সঞ্চিত ধানে গ্রামে ছোটখাটো একটা বারোয়ারী উৎসব করিবার জন্য। ফলে, দল হইল, ঝগড়া বাধিল। শেষে সমবায়-ভাণ্ডারের ধান উঠিল মহাজনের গোলায়, বারোয়ারীর সমস্ত খরচ তিনি জোগাইবেন এই 'কড়ারে'। তারপর মহালক্ষ্মী আর তাঁহার গোলা হইতে অবতরণ করেন নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এইবার বিপুলবাবু অনুপমের সর্ব্বনাশে মনোযোগী হইলেন। বাকী খাজনা, জাল হ্যাণ্ডনোট, মিথ্যা ফৌজদারী, অনুপম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বস্বান্ত হইল। আদালতে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল গ্রামের যুবকেরাই, যাহাদের দুঃখে দরদ দেখাইতে গিয়া তাহার এই অবস্থা। একে একে অনুপমের ভূসম্পত্তি গরুবাছুর, মিনতির অলঙ্কার, সব গেল। আজ একটা একতরফা ডিক্রির দায়ে প্রিয়তমা মৃতকন্যার শেষ স্মৃতি একটি ছোট হার, দুটি দুল, আর দু'গাছি বালা মহাজনের হাতে তুলিয়া দিয়া অনুপম শয্যা গ্রহণ করিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। আট বৎসরের ছেলে সুপ্রকাশ ইস্কুল হইতে আসিল। অন্য দিন আসে যেন বাঙ্ময় হইয়া; নাকে মুখে চোখে কথার তুবড়ি ছুটাইয়া। ইস্কুলে নিত্য নূতন কত যুগান্তরকারী ব্যাপার ঘটে, তার এক লম্বা ফিরিস্তি মাকে প্রত্যহ দেয়। পথে হাতীর মত যে শেয়াল আর তালগাছের মত যে সাপ সে নিত্য দেখে, মা'র কাছে আড়ম্বরে সেই গল্প করিতে করিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যায়। সেই চপল ছেলের মুখ আজ কে জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

মা গেল রান্নাঘরের দিকে ছেলেকে খাবার দিতে। সুপ্রকাশ আস্তে আস্তে গিয়া মা'র আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মা বাবার কি হয়েছে? উদ্‌গত অশ্রু অতি কষ্টে চাপিয়া মিনতি বলিল,—ও কিছু না, বাবা, এম্‌নি একটু মাথা ধ'রেছে; ঘুমুলেই সেরে যাবে। তুই খেয়ে নে।

—মা, আমি ইস্কুল থেকে আস্‌ছি; পথে বাবুদের 'মিনি' দাঁড়িয়েছিল। কাছে আস্‌তেই তার গলার হারটা আমাকে দেখিয়ে বল্‌লে—

এই দেখ্‌, তোর বোনটির হার; সেই যে ম'রে গিয়েছে, সেইটার, জানিস্‌! দেখ্‌লাম, লকেটে আমার বোনটীর নাম লেখা।

সুপ্রকাশ আর বলিতে পারিল না; ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা ছেলেকে বুকে চাপিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সুপ্রকাশ বলিল,—হাঁ মা, মিনি বলে,—তার বাপ বোনটির সব গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে গিয়েছে! আর, আমাদের নাকি বাড়ি হ'তে তাড়িয়ে দেবে, ওরা?

—না রে, না, তুই খেয়ে নিবি, আয়। আয়, আমি খাইয়ে দি'।

মা জানে,—আজ ছেলের মনের যা অবস্থা, খাওয়াইয়া না দিলে এক গ্রাস ও মুখে তুলিবে না। বোন্‌টি ছিল তার একান্ত প্রিয়। তার মৃত্যুর পর প্রথমটা ছেলেকে সাম্‌লাইতে মা বাপকে দারুণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাই, পারত-পক্ষে, ছেলের সাম্‌নে মৃত কন্যার প্রসঙ্গ তাহারা উত্থাপন করিত না।

ভাত সুপ্রকাশের গলায় আজ এক গ্রাস ও পার হইল না। সে মার কোল হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল বাড়ির বাহিরে। মিনতি চোখের জলে ছেলের ভাতের থালা ভাসাইতে লাগিল।

রাত্রে অনুপমের জ্বর প্রবল হইল। নিরুপায় মিনতি শুধু কাঁদিল সারা রাত ধরিয়া। পাশে সুপ্রকাশ না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামীর এই অবস্থা। চিকিৎসা খরচ সঙ্কুলান ত দূরের কথা,—রাত পোহা'লে ছেলেকে খাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠায়, তেমন সম্বল ও ঘরে আজ নাই!

এক সপ্তাহ হইল, অনুপমের জ্বর হইয়াছে। দিন কাটে, তাই মিনতিরও দিন কয়টা কাটিয়াছে। অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছে; চিকিৎসার উপায় নাই।

—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্! ঢোল সোহরৎ দ্বারা জানানো হইতেছে—অনুপম বাঁড়ুজ্যের বাস্তুতে বাঁশগাড়ী দখল লইতেছেন বিপুলবাবু।

কবে কবে মাম্‌লা হইয়াছে, বাস্তু নীলাম হইয়াছে, অনুপম কিছুই জানে না!

জ্বরে লুপ্তসংজ্ঞ অনুপমের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে মিনতি ডাকিল—ওগো, ওঠো! বাড়ি নীলাম হ'লো!

এঁ্যা!—অনুপম ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল। স্খলিতকণ্ঠে ডাকিল—সুপ্রকাশ! সুপ্রকাশ দূরে বসিয়াছিল; শুষ্ক-ম্লান তাহার মুখখানি। নীরবে বাবার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

'মিনতি!'—বলিতে বলিতেই অনুপম উঠিয়া দাঁড়াইল।

'এসো'—

ডান হাতে সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া এবং বাম হাত মিনতির কাঁধে দিয়া টলিতে টলিতে অনুপম বাড়ির বাহিরে পথে দাঁড়াইল। মিনতি ডান হাতে স্বামীর বক্ষ জড়াইয়া তাহার পতনকে প্রাণপণে ঠেকাইয়া রাখিতেছিল।

গ্রামের পথ বাহিয়া চলিয়াছে,—রক্তচক্ষু শ্লথগতি অনুপম ; ডান পাশে তার দীনবেশে শুষ্কমুখ সুপ্রকাশ ; বাম দিকে উদ্‌গতাশ্রুনয়না আনমিতমুখী মিনতি। গ্রামবাসীরা দেখিল। হয়তো কারো বুকে বাজিলও। কিন্তু, এই পরিণামের ভয়ে কেহ আগাইল না দরদ দেখাইতে!

টলিতে টলিতে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া অনুপম গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে ডাঙ্গায় এক বটতলায় আসিয়া পড়িল। পাশেই সাঁওতাল পাড়া। সাঁওতাল সর্দ্দার বৃদ্ধ কালু মাঝি আসিল। মিনতি কাঁদিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিল।

কালুর আদেশে মাঝিরা দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে বাঁশ ও খড় দিয়া পল্লীর অনতিদূরে একটি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। কয়েক জন ছুটিয়া মাইল দুই দূরবর্ত্তী বাজারে গিয়া কিছু নূতন কাপড়-চোপড়, বিছানার কিছু সরঞ্জাম এবং কিছু পথ্য কিনিয়া আনিল। অল্প সময়ের মধ্যে 'বাবুই' দড়ি দিয়া ছোট দুটি খাটিয়া ঘিরিয়া দিল।

মিনতি ও সুপ্রকাশের রান্না খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া কালু বলিল—মা ঠেক্‌রুন্! চান ক'রে এসে রান্নাবান্না ক'রে 'খোকুভাই'কে কিছু খ', তুই-ও দুটো মুখে কিছু দে! আমি একটো ডাগদর লিয়ে আসি ; বাবুর জ্বর টো বেশী হইছে, লাগছে।

—এরা কি মানুষ !—না দেবতা! মিনতি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর রোগ, অভুক্ত পুত্রের ম্লানমুখ, নিজের পথ-ভিক্ষুকের অবস্থা, সব যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাহার মনে হইতেছিল—এ কোন্ স্বর্গে এলাম।

কালুর কথার উত্তরে মিনতি কেবল সজল চোখে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিবার সঙ্গতি তাহার ছিল না। কালু চলিয়া গেল ডাক্তার আনিতে। মেঝেন-রা (সাঁওতাল রমণীরা) মিনতিকে জোর

করিয়াই রন্ধন, স্নান ও ভোজনে বাধ্য করিল। সুপ্রকাশকে ভুলাইবার জন্য পাখীর বাচ্চা দিল, ফুল দিল, জনার দিল।

ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনুপমের পরিচিত। মহাজন শ্রেণীর উপর গালি বর্ষণ করিয়া তিনি অনুপমের উপর সহানুভূতির গাঢ়তা প্রতিপন্ন করিলেন। রোগী দেখিলেন; কালু ভিজিট দিল,—তিনি চলিয়া গেলেন।

—কে যেন একজন ডাক্তার বাবুকে একদিন বলিয়াছিলেন,—এ অবস্থায় ভিজিটটা নেওয়া কি আপনার উচিত হয়েছে, ডাক্তার বাবু! উত্তরে ডাক্তার বাবু মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়াছিলেন,—দেশের সবারই অবস্থা প্রায় এক রকম; সুতরাং, সব জায়গায় ভিজিট ছেড়ে দিলে আমার কি ক'রে চলে।

ডাক্তার বাবুর নির্দ্দেশ মত শুশ্রূষা চলিল। কালু ডাক্তার বাবুর কাছ হইতে জানিয়া লইয়াছিল,—কি কি দরকার হইবে। মিনতির হাতের কাছে শুশ্রূষার সমস্ত উপকরণ সে জোগাইয়া দিল। 'মেঝেন্'-রা সারারাত বসিয়া কাটাইল। মিনতির একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ নড়িল না। কালুর মেঝেন বলিল—ঠেকুরুন্, আমরা যি উ সব কিছুই জানি না; রুগীর যত্ন-টত্ন তুদের মতন কি ক'রে জান্‌বো গো! জান্‌লে কি তুকে রাত জাগতে দিতম্! বাবুর ভাল হ'লে, তুরা সব শিখিয়ে দিস্ আমাদিকে।

সাঁওতালেরাই এবার অনুপমের পরমায়ু জোগাইল। এত সমবেদনা,—এত শুভেচ্ছা ভগবান্ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রোগটা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত জটিল আকার-ই ধারণ করিয়াছিল; ডাক্তার বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সাঁওতালদের সহৃদয়তাই অনুপমকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনিল।

পঁয়তাল্লিশ দিনের পর অনুপম আজ পথ্য করিবে। ভোরবেলা

হইতে সাঁওতালদের মধ্যে আনন্দের কলরোল উঠিয়াছে। মাদল, বাঁশী, নাচ, গান, পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে। একটা গাছের গোড়ায় বেদীর আকারে নির্ম্মিত একটা স্থান গোবর মাটী দিয়া লেপা হইয়াছে। ফুল, পাতা অনেক আসিয়াছে।

মিনতি কালুকে জিজ্ঞাসা করিল,—ও সব কি হচ্ছে, কালু!

কালু নাচিতে নাচিতে বলিল,—'বোঙা'র (দেবতার) পূজো হবে, মা ঠেকৃরুন। বাবু যি আজ পথ্যি করবে গো!—ভাইটি! আমাদের পূজো দেখ্‌বি না? আয়!

'ভাইটি'র সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই, তাহাকে কোলে করিয়া নাচিতে নাচিতে কালু অনুপমের কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুপ্রকাশ ভারী আমোদ বোধ করিল।

জীবনে এত আনন্দ,—এমন প্রাণারাম তৃপ্তি, মিনতি কোনদিন পায় নাই। মানুষের উপর মানুষের সহৃদয়তা এত অকৃত্রিম হইতে পারে,—সে এই প্রথম দেখিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল; চোখে শ্রাবণের প্লাবন বহিয়া গেল!

বলা নিষ্প্রয়োজন,—সমস্ত খরচ-ই জোগাইয়াছে সাঁওতালেরা ধান বেচিয়া!

পথ্যান্তে অনুপম শুইয়াছিল, তাহার কুটীরে খাটিয়াটীর উপর। পাশে বসিয়া মিনতি আস্তে আস্তে পাখা করিতেছিল। কুটীর দ্বারে কালু আসিয়া দাঁড়াইল; কোলে সুপ্রকাশ। পিছনে একদল সাঁওতাল।

সুপ্রকাশের ধূলিমলিন পা দুটি ঝাড়িয়া দিতে দিতে মিনতির উদ্দেশ্যে কালু বলিল,—মা ঠেকৃরুন্ আমাদের একটো কথা ভুকে রাখ্‌তে হঁবে। তুরা ওই 'ভদ্দরনোক'দের পাড়াতে আর যেতে পাবি না; উরা

মানুষ লয়। ঐখানে ডাঙ্গায় তুদের লেগে আমরা একমাসের মধ্যি ঘর তুলে দোবো।

অনুপম মুগ্ধকণ্ঠে বলিল,—তাই হবে কালু, তোরা যে আমাদের কিনে রেখে দিয়েছিস্! তোদের কথা ঠেল্‌বার সাধ্য কি আমাদের আছে রে!

অসভ্য, ইতর সাঁওতালের দল আনন্দে নাচিয়া উঠিল; যেন মহোৎসবে মাতিয়াছে তাহারা।

ঠিক সেই সময় সভ্য, ভদ্র মানিকচকের মহাজনপ্রবর ভাবিতে-ছিলেন,—কি ক'রে ব্যাটাকে আরও ভালো ক'রে জব্দ করা যায়!—আর, গ্রামের অধিবাসীরা অনুপমের অবিমৃষ্যকারিতার তীব্র সমালোচনা করিতেছিল এবং অসভ্য অনার্য্যদের মধ্যে বাস ও তাহাদের দান গ্রহণহেতু সভ্য সমাজ হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিবার জন্য উত্তেজিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল!

অনুপম ও মিনতির প্রবল বাসনা হইয়াছিল,—এই সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার স্বর্ণকিরণ ছড়াইয়া দিতে। কালু জোড় হাত করিয়া বলিয়াছিল,—তুদের উ সভ্যতা আমাদের মধ্যি আর ছড়াস না, বাবু! তাহ'লে যে আমরা-ও ভদ্দরনোক হঁয়ে যাবো! সব হ'তে পারি, ভদ্দর নোক' হ'তে পার্‌বো না।

ব্যথার উপহার

কলেজে কুমারী বীণা চ্যাটার্জ্জির খাতির ছিল। সমাজ-কারার মরিচা-ধরা লৌহশৃঙ্খল সে বহু পূর্ব্বেই চুরমার করিয়া দিয়াছিল, আধুনিকতম সুসংস্কৃত ঔদার্য্যের খড়্গাঘাতে। সকল প্রকার সংস্কৃতির আলোচনায় পুরোবর্ত্তিনী ছিল সে; চেয়ার পাওনা ছিল তাহার-ই; জয় ও যুগোচিত ভোটাধিক্যে তাহার-ই কণ্ঠমাল্য রচনা করিত। সে কথায় কথায় বলিত,—'মন-ই আমার জগৎ, মন-ই আমার ভগবান্; মনের বাহিরে কোন রীতিনীতি বা সংস্কৃতির তোয়াক্কা আমি রাখি না।' মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বান্ধবী, বান্ধব, সমস্ত মহলেই খাতির সে পাইয়াছিল প্রচুর, এবং আধিবিশেষ-ক্লিষ্টাদের দুঃখে সমবেদনা-ও ঢালিত অজস্র। সকলেই বলিত, উদারনৈতিকতার জন্য বীণার পাওয়া উচিত,—একটা নোবেলপ্রাইজ।

মীনা কিন্তু, 'হাঁ, না' কিছুই করিত না; এসব ব্যাপারে অভিনিবেশও দিত না। এজন্য চারিদিক হইতে তাহাকে খোঁটা খাইতে হইত যথেষ্ট। তা'-ও সে গায়ে মাখিত না। কিন্তু আজ বান্ধবী বীণার ঝাঁঝালো মন্তব্য মীনার চিত্তকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। পূজার বন্ধে মীনা সতীর্থা বীণার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। ছোট পল্লী; তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে; ছবির মত সুন্দর। গ্রামের ছোট 'পাহাড়ে' নদীটি সকাল সন্ধ্যা মীনাকে কোথাও থাকিতে দিত না; এমনি মোহবিস্তার করিয়াছিল তাহার মনের উপর।

বীণা কোনদিন আসিতে না পারিলে মীনা একা-ই চলিয়া আসিত বেড়াইতে। তামাসা করিয়া বীণা বলিত, এখানে একটা আস্তানা বেঁধে ফেল, মীনা; বেশ থাক্‌বি, আর দু'বেলা নদীর ধারে ব'সে ব'সে কাব্য করবি।

মীনা জবাব দিত,—সে স্বপ্ন সে দেখে না, তা' নয়। তবে, বাস্তবের সঙ্গে তার স্বপ্নের সামঞ্জস্যের সূত্র কোথায়, সেইটার সন্ধান পাওয়াই তো দায়!

বীণা প্রাজ্ঞ অভিভাবিকার গাম্ভীর্য্য মুখে আনিয়া অথচ কণ্ঠস্বরে শ্লেষের ঝাল মাখাইয়া বলিত, এই 'অজ' পাড়াগাঁয়ে আপাততঃ তোর 'স্বপ্ন' সাফল্যের সম্ভাবনা সত্যিই বড় কম। তোরা চা'স্, জীবনটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে, হাঁফিয়ে ওঠার বিকট আনন্দ উপভোগ ক'রতে। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ জীবনে তোদের বিতৃষ্ণা! অদ্ভুত! এই মহা মুক্তির যুগে দেশবিদেশে বিদুষী নারীদের আনন্দকলরোল, আর, এই সতীত্বকুষ্ঠবিকৃত মনোবৃত্তিকে তোরা কেমন ক'রে পোষণ করিস্— কেমন ক'রে সমাজের এই উৎকট প্রথাগুলোর দাসত্ব করিস্—আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারি না। একটা পুরুষের স্বার্থপরতার অন্তরালে তোরা আজও খনন করিস্, নিজের জন্য আঁধার-ভরা কূপ! ওই দুর্ব্বলতাগুলো কবে যে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারবি তোরা! পুরুষদের দোষ বেশী কোথায়? তোরাই ত সেগুলোকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলে দিস্। তারপর 'স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীস্বাধীনতা' ব'লে চেঁচিয়ে মাথা ফাটিয়েও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি না আমরা!

মীনা এ তিরস্কারের জবাব দিতনা। বিতণ্ডা করা তাহার অভ্যাসের বাহিরে। তা' ছাড়া, সে জানে, প্রতিবাদ সহ্য করা বীণার স্বভাব নয়। বাধা পাইলেই সে ক্ষেপিয়া উঠে। তর্কে তো কোন প্রকারে জিতিবে-ই;

তার উপর, এমন কটু মন্তব্য করিয়া বসিবে, যাহা নিতান্তই দুষ্পাচ্য। মহাষ্টমীর দিন যে কাণ্ডটা বীণা বাধাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে আজও মীনার মনের ভিতর একরাশি বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে।

দেশে বীণাদের কিছু জমিদারী আছে। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ নায়েব গোমস্তারাই করিয়া থাকে। বীণা দেশে বড় একটা আসে না। কলিকাতার বাড়িতেই থাকে। কে-ই বা কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে, পাড়াগাঁয়ে আসিতে চায়! পূজার সময়ে একবার করিয়া আসে, পৈতৃক দুর্গাপূজাটা এখনও উঠিয়া যায় নাই বলিয়া। বলা বাহুল্য, সহর প্রবাসীদের ভিটে আগলাইতে, যেমন বৃদ্ধা বিধবা পিসিমা, কাকীমা বা এমনি একজন কেউ থাকেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বীণার ইচ্ছা পূজাটা উঠাইয়া দেওয়া। এই বাজে খরচটায় তাহার একান্ত আপত্তি। এই আলোর যুগে, একটা মাটীর পুতুল গ'ড়ে তার পূজা করা, আর সেই উপলক্ষ্যে কতকগুলো টাকা জলে ফেলা সে উৎকট মূঢ়তাই মনে করে।

সেদিন মহাষ্টমী। বীণা ও মীনা পূজার দালানে বসিয়াছিল। মীনার বড় ভালো লাগিয়াছিল, সেই সুগঠিত দেবীমূর্ত্তি,—সেই উদাত্ত মন্ত্রপাঠ! পূর্ব্বে সে এমন করিয়া পূজা দেখিবার সুযোগ পায় নাই; তাই পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে-ই বসিয়া থাকে।

বীণা কথা তুলিল, মূর্ত্তিপূজা ও বলিদান সম্বন্ধে; প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িল, মন্দির প্রবেশ, হরিজন-আন্দোলন, সর্দ্দাবিল ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরোহিত তমোহরণ ভট্টাচার্য্য যুবক, সুপণ্ডিত; সর্ব্বোপরি, গলদশ্রুনেত্রে স্খলিতকণ্ঠে যখন সে স্তোত্র পাঠ করে, তখন বুঝি মরুবক্ষেও প্লাবন ছুটে! কিন্তু, একটু নিরামিষ; পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আধুনিক আদব-কায়দার বিশেষ ধার সে ধারে না। তবে, দেশের খোঁজ-খবর কিছু

রাখে। 'টুলো'দের একটা বদনাম তো আছে-ই,—তা'রা তর্ক পাগল। আর, বীণা তো তর্কে আজ পর্য্যন্ত কোথাও পরাজিত হয় নাই। তর্ক ঝগড়ায় পরিণত হইল। শেষে যখন বীণা দৃপ্তকণ্ঠে তমোহরণকে বুঝাইয়া দিল, তা'রা পুরুষানুক্রমে বীণাদের বংশের নিমকখোর, অনুগ্রহ-পুষ্ট চাকর; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে গলহস্ত দিয়া বিদায় দেওয়া যায়, তখন তর্কমাতাল তমোহরণের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অপমানে তাহার চোখ দু'টী একবার জ্বলিয়া উঠিল; সারা মুখটায় কে যেন সিন্দূর ঢালিয়া দিল। তারপর, পুঁথি গুটাইয়া লইয়া অবমাননাহত তমোহরণ নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। কাতর মিনতি, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—কিছুতেই তাহাকে রাখা গেল না। শেষে, আর কাহাকে ডাকিয়া কোনপ্রকারে সে বৎসরের মত 'দুর্গাদায়'টা সাম্‌লানো হইল।

এই ব্যাপারে মীনার মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তার বেদনা আজও তাহার অন্তরের এক কোণে সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেদিন বৈকালে শরীরটা ভালো না থাকায় বীণা বাহির হয় নাই; মীনা একা-ই বেড়াইতে আসিয়াছিল নদীর দিকে। সূর্য্য ডোবে-ডোবে, মীনা বেড়াইয়া ফিরিবে,—দেখে, কোথা হইতে একটা বোঁচ্‌কা হাতে করিয়া তমোহরণ দ্রুতপদে ফিরিয়াছে। খালি পা, গায়ে একখানা মোটা চাদর নিতান্ত অ-গোছালোভাবে জড়ানো। পথক্লান্তি, কি দুশ্চিন্তা, জানি না, তাহার মুখখানায় ঠিক স্বাভাবিকতা রাখিতে দেয় নাই। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ তাহার শ্রান্ত মুখশ্রীকে বড় করুণ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। মীনার দিকে নজর পড়িতেই, বোঁচ্‌কাটা-শুদ্ধ একটু তুলিয়া তমোহরণ একটা নির্ব্বাক্ নমস্কার করিল। তারপর আগাইয়া চলিল শ্লথপদে, গ্রামের দিকে। মীনা প্রতিনমস্কার করিল;

কিন্তু, তমোহরণ তাহা দেখিতে পাইল না, হয় তো বা দেখিয়াও দেখিল না! পিছন হইতে সঙ্কোচ-মধুর কণ্ঠে মীনা ডাকিল, দাঁড়াবেন একটু! তমোহরণ অপ্রস্তুত হইয়া সসঙ্কোচে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মীনাও যেন একটু থতোমতো খাইয়া গেল। পরিচিত হইলেও নির্জ্জন নদীতীরে আলাপ-আলোচনা করার মত ঘনিষ্ঠতা তাহাদের জন্মায় নাই। বীণাদের পূজামণ্ডপে মাত্র দু'একদিনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সহসা ডাকিয়া ফেলার পর মীনার হুঁস হইল, যেন স্থান, কাল, পাত্র, কোনটাই তার ব্যবহারের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না! দুর্ব্বলতা মীনাকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল।

মীনাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তমোহরণ বলিল,—আমাকে কিছু বল্‌ছিলেন?

—বড় রেগে গেছেন সেদিন, বীণার ওপর আপনি,—এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত এই কথা কয়টার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল, মনে হয় না। নির্জ্জনে একজন অর্দ্ধপরিচিত যুবককে যাচিয়া ডাকিয়া কথা কয়টা না বলিলে-ও চলিত। তা' ছাড়া, সঙ্কোচের জড়িমা গায়ের জোরে কাটাইতে গিয়া মীনা নিজেকে যে অধিকতর অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলিতে ছিল, সেটা তার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সহজেই ধরাইয়া দিল।

তমোহরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল,—না, মীনা দেবী, যাচক, ভিক্ষুক আমরা, আমাদের রাগ করবার অধিকার কোথায়! আমরা পতিত, একঘরে; ঘৃণা এবং অবমাননাই আমাদের ন্যায্য পাওনা! তবে, প্রতীকারের সামর্থ্য না থাকলেও অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়ার অধিকার আজ-ও নিঃশেষে লোপ পায় নাই।

বীণা হইলে মুখ টিপিয়া জবাব দিত,—সে কি, ঠাকুর! আপনারা-ই তো জগৎটাকে আজ একটা অনুষ্টুপের প্রয়োগে পতিত ক'রে দিচ্ছেন;

কা'ল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য-বিনিময়ে পরম ঔদার্য্যের সহিত আবার কোলে টেনে নিচ্ছেন। আর, তার সমর্থনে শুধু অনুষ্টুপ নয়, কত ইন্দ্রবজ্রা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত তৈরী [illegible] বস্‌ছেন। আপনারা আবার পতিত হ'তে যাবেন, কোন্ দুঃখে? আর, ঘৃণা করা তো আপনাদের-ই একচেটে; সে সুনাম যুগ যুগ হ'তে আপনারাই অর্জ্জন ক'রে আস্‌ছেন। তবে কি আজ 'গাড়ী পর্ লা'?

মীনা কিন্তু কিছুই বলিল না। তাহার ভিতরে একটা দুর্ব্বল কোমল বৃত্তি ছিল। কাহাকেও লাঞ্ছিত, অবমানিত হইতে দেখিলে লাঞ্ছনাকারীর উপর ক্রোধ তাহার হইত না, লাঞ্ছিতেরই প্রতি দরদে চিত্ত ভরিয়া উঠিত। তাই, সেদিন হইতে তমোহরণের জন্য তাহার মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ খচ করিতেছিল। তমোহরণের অভিমানক্ষুব্ধ কথা কয়টা তার মনে আর একটু দরদই আনিয়া দিল।

আনতমুখী মীনা দরদ-কোমলকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, মতান্তর থেকে মনান্তর উপস্থিত হয়ে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল সে দিন! আমার বড় লেগেছে ব্যাপারটায়, বীণাও আন্তরিক দুঃখিত।

তমোহরণের মুখটা একটু শক্ত হইয়া উঠিল। মীনার দরদ তাহার ক্ষতটাতেই ক্ষার নিক্ষেপ করিয়াছে!

—ধন্যবাদ, বীণা দেবীকে বল্‌বেন—অপমান করাটা খুবই সহজ। কিন্তু অকারণে সদর্প বাচালতা ক'রে কারও অপমান করা কতখানি ন্যায্য,—শিষ্টাচার বা শিক্ষা-সংস্কৃতি তার কতটা অনুমোদন করে, তা কি স্থির মস্তিষ্কে একটু ভাবা উচিত নয়? থাক্‌গে, এ অপ্রিয় আলোচনা না বাড়ানোই ভাল। নমস্কার, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।

তমোহরণ ভিন্ন পথে চলিয়া গেল।

তারপর দু'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; তমোহরণের সঙ্গে মীনার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যথা-করুণ মুখচ্ছবি মীনার চিত্তপট হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই। অবসর সময়ে, চিন্তাস্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় সেই সুদূর সাঁওতাল-পরগণার ক্ষুদ্র পল্লীতে, বীণাদের গাঁয়ে, যেখানকার আকাশ বাতাস তমোহরণের বেদনারুণ মুখের করুণ সৌন্দর্য্যে ভরা।

কোন প্রয়োজন না থাকিলেও বি-এ পাশ করার পর বীণা চাক্‌রী লইয়াছে। বিবাহের প্রস্তাবে মুখে যথাসম্ভব ঘৃণার প্রলেপ মাখাইয়া বলে—'আর ও সনাতনী ন্যাকামির কথাটা দয়া ক'রে আমার কাছে না-ই বা তুল্‌লেন! ও-সব হীন আত্মবিলোপের মধ্যে আমি নেই।' তাহার সমর্থক বান্ধব-বান্ধবীগণকে লইয়া সে বেশ একটি ছোট সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে।

সগৌরবে বি, এ, পাশ করার পর এম, এ, পড়িবার জন্য, বাপ-মা, বন্ধু-বান্ধব সকলেই মীনাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু মীনার উৎসাহ যেন কমিয়া আসিয়াছে। তাহাকে রাজী করা গেল না। বাবা কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন ব্যারিষ্টার, মা-ও উচ্চশিক্ষিতা; মীনা তাঁহাদের একমাত্র মেয়ে। এখানে এম, এ-টা দিয়া, বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আসিবে,—এ সাধ বাবা মা দু'জনেরই। কিন্তু তাঁহাদের 'সাধ' মিটাইতে মীনার কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

আজ মীনার বাৎসরিক জন্মোৎসব। বীণা আসিয়াছে। লেক্ রোডের উপর মীনাদের প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীখানা আমন্ত্রিত অতিথি-বর্গের শুভ-সম্মিলনে আনন্দবিহ্বল। বীণা তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও

আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিল। আত্মীয় বান্ধবদের স্নেহের উপহারে মীনার ঘর বুঝি ভরিয়া যাইবে!

এত উপহার, এত প্রীতি, এত গীতি, মীনার কিন্তু মনোবীণার কোন্ তারটা যেন বেসুরা বাজিতেছে। উৎসবের ছন্দে সে আপনাকে মিলাইতে পারিতেছে না।

সকালের দিকে স্নানান্তে মীনা নিজের ঘরে বসিয়াছিল, সহসা একটা গোলমালে পথের দিকে নজর পড়িল তার। বাইকের ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারিয়া একটি যুবক পড়িয়া গিয়াছে।

বাইক-চালকের সহিত কথায় কথায় ঝগড়া উপস্থিত হইলে, ক্রুদ্ধ জনতা তাহাকে থানায় পাঠাইয়া দিল এবং আঘাত গুরুতর বোধে যুবককে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল। দূর হইতে যুবককে দেখিয়া মীনার মনে হইল যেন তাহার মুখাখানা পরিচিত। কিন্তু ভালো দেখিতে না পাওয়ায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলনা। শেষে খোঁজ লইয়া জানিল, সাঁওতাল পরগণার কোথায় যেন যুবকের বাড়ি; কলিকাতায় তাহার এক আত্মীয়বাড়ি হইতে দেশে ফিরিতেছিল, পথে এই দুর্ঘটনা। মীনার সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল; তাহার যেন মনে হইল, সে তমোহরণ। ব্যথায় বুকটা ভরিয়া উঠিল মীনার। বীণা আসিলে তাহাকে সন্দেহের কথা বলিল।

অবজ্ঞাভরে বীণা বলিল—পাগল হয়েছিস্ তুই! সে ভূত কল্‌’কাতায় মর্‌তে আস্‌বে! দেখ্ গে’ কার প্রায়শ্চিত্তের বিধান খুঁজছে—টোলে প’ড়ে প’ড়ে! ও-সব বাদ দে; এখন এ-ধারে আয়, কাজ অনেক।

বীণার এই দরদহীনতা মীনার ভাল লাগিলনা। কিছু না বলিয়াই তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিল, নিমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনায়। কিন্তু

এই উৎসব তাহার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে সৃষ্টি করিল একটা কাতর অস্বস্তির।

সারাদিন ধরিয়া আনন্দের লৌকিক অভিনয় সে করিয়া গেল; এবং সেই জন্যই তাহার ক্লান্তি বোধ হইতেছিল বেশী। তাহার সহজতৃপ্তি-সরস মুখখানা অবসাদের গ্লানিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

বীণা কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছে তাহার অস্বস্তি। উৎসবান্তে রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া বীণা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তোর, মীনা! এত তুর্ম্মনা আজ এই উৎসবের দিনে!

মীনা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, সকালবেলার তুর্ঘটনাটা আমায় সারাদিন ব্যথা দিচ্ছে, বীণা! আমি কোনরকমেই মনের স্বাভাবিক অবস্থা আন্‌তে পার্‌ছি না। যদি সে তমোহরণই হয়, তা'হলে বাস্তবিকই বড় অশোভন হ'য়ে গেছে। যখন জান্‌তে পার্‌বে, আমাদের দরজার পাশে, আমারই চোখের উপর বিপন্ন হয়েছিল সে,—অথচ একটা মৌখিক সহানুভূতিও পায় নাই, তখন তুঃখ রাখবার, লজ্জা ঢাক্‌বার ঠাঁই মিল্‌বে না।

বীণার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, সমবেদনা বা কারুণ্যের লেশ মাত্রও তাহার মনে জাগে নাই। ঔদাসীন্যবিরস কণ্ঠে বলিল,—তাই যদি হয়, কা'ল সকালের দিকে হাঁসপাতালে খোঁজ নিলেই চল্‌তে পারে!

মীনা চুপ করিয়া রহিল। বীণা বলিল, আচ্ছা মীনা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

মীনা সমর্থক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল।

—আমি কিছুদিন থেকে তোর মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি। কারণে, অকারণে, তমোহরণের প্রসঙ্গ তোর পক্ষে

অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। আমার সন্দেহ সত্য হ'লে পরিতাপের সীমা থাক্‌বে না। সময়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

এই নিষ্ঠুর আত্মীয়তা মীনার ভাল লাগিল না। সে শক্ত-কণ্ঠে জবাব দিল—তোর ইঙ্গিত বুঝেছি, কিন্তু ততটা এগিয়ে যাই নাই। আর, ঘটনা-তরঙ্গের আঘাতে এগিয়েই যদি প'ড়তে হয়, তা কি খুব বেশী পরিতাপের বিষয় হবে বীণা!

ঝাঁঝের তীব্রতায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া বীণা বলিল,—তোর মাথা খারাপ হয়েছে মীনা!

হাইকোর্ট পূজায় বন্ধ হইয়াছে। মীনার বাবা, ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জী লক্ষ্ণৌ যাইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মিসেস্ মুখার্জ্জী, মীনা, বীনা এবং একটি তরুণ ব্যারিষ্টার, মিষ্টার ঘোষ। এই ঘোষ সাহেবকে উৎকর্ষ জ্ঞাপনের প্রচলিত ভাষায় 'স্কোয়ার' বলা যাইতে পারে। পাঠ্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন অপরিমিত। আর দৈহিক সৌন্দর্য্য, হাজারে একটাও তেমন মিলে না। অল্পদিনে ব্যবসায়ে যা' পসার করিয়াছেন, তাহাতে ব্যারিষ্টার মহলে একটা হিংসার ভাব দেখা দিয়াছে। ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জীর সঙ্গে ইনি আলাপ জমাইয়াছেন বেশ! মীনার সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধের আশাও রাখেন। ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জী বা তাঁহার স্ত্রীর তাহাতে আপত্তি নাই। মীনার দিক্ হইতে কিন্তু আপত্তি বা আগ্রহ কিছুই জানা যায় নাই। সুতরাং আত্মপ্রকটনের নিত্য নূতন ভঙ্গী দ্বারা মীনার কাছে আপনাকে অতি প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে মিষ্টার ঘোষ এখন ব্যস্ত।

হাওড়া ষ্টেশনে রিজার্ভড্ বার্থটার সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফর্মে মিষ্টার

ঘোষ কখনও সৈনিকের, কখনও ধনিকের, কভু বা প্রেমিকের চালে পাদচারণা করিতেছিলেন। ট্রেণ ছাড়িতে বেশী দেরী নাই। একটা লোক তাড়াতাড়িতে কিসে যেন পা লাগিয়া পড়িয়া যায় ব্যারিষ্টার ঘোষের গায়ের উপর। ক্রোধান্ধ ব্যারিষ্টার তাহাকে লাথি মারেন। লোকটার কোমরে লাগে একটু বেশী মাত্রায়। ব্যারিষ্টারের ক্রুদ্ধ-তর্জ্জনে একটা ছোট ভিড় জমিয়া যায়। প্রায় সকলেই লোকটার গ্রাম্যতার দোষ দিয়া কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া সরিয়া পড়ে। গোলমাল শুনিয়া বার্থের ভিতর হইতে মীনা আসে গাড়ীর দরজার কাছে, ব্যাপার দেখিতে। বীণা এ-সব ছোট-খাটো ব্যাপার গ্রাহ্য করে না। সে নিশ্চিন্তমনে একখানা ইংরাজী মাসিকের পাতায় চোখ বুলাইতেছিল।

লোকটা তখন অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়াছে। মীনা গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আসুন। সে মীনার মুখের দিখে একবার চাহিল; দারুণ অনিচ্ছা থাকিলেও মীনার দরদভরা ডাক সে উপেক্ষা করিতে পারিলনা, পরবশ হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া গেল।

ব্যারিষ্টার মুখাজ্জির দিকে চাহিয়া মীনা ধীরভাবে বলিল—বাবা, ইনি পণ্ডিত তমোহরণ শাস্ত্রী। বীণাদের গাঁয়ে বাড়ী। আমার সঙ্গে সেবার পূজার বন্ধে আলাপ।

তখন Oh ! I see,'—মাফ্ কর্ব্বেন'-'ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে-Punditjee, excuse me please,' ইত্যাদি শিষ্টাচারের চাপে 'পণ্ডিতজী'র লাথির ব্যথাটা আরও টন্ টন্ করিয়া উঠিল। অপমান ক্ষোভ, লজ্জা, এক সঙ্গে তা'র মনের ভিতর হুটোপুটি আরম্ভ করিয়া দিল।

ততক্ষণ গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। তমোহরণ চমকিয়া উঠিল। এঁদের সঙ্গে এক কামরায় যাইতে সে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

পরিচিত হইলেও—Oh! I see' বলিয়াই বীণা আপ্যায়নের সমাপ্তি করিয়াছিল এবং পরম গম্ভীরভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তমোহরণ হঠাৎ উঠিয়া মীনার দিকে চাহিয়া বলিল—মীনা দেবী, আপনার করুণার প্লাবনে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়েছি। ছোটবেলা থেকে দয়া-দরদ দেখাবার আমার কেউ ছিল না; অনাদর এবং অবজ্ঞার ভিতর দিয়েই গত জীবনের প্রায় দিনগুলো কেটেছে। বাকী দিনগুলোও হয়ত এই ভাবেই কাট্‌বে। সুতরাং স্নেহ-করুণা দেখিয়ে আমার অভ্যাস খারাপ ক'রে দেবেন না। নমস্কার, আমি অন্য একটা কামরায় যাই; সকলকেই নমস্কার জানিয়ে যাচ্ছি।

তাঁহারা সকলে-ই প্রতিনমস্কারান্তে তমোহরণকে সেই কাম্‌রাতেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন; শুধু মীনা যাইতে নিষেধ করিল না এবং প্রতিনমস্কারের পরিবর্ত্তে তমোহরণের ধূলিমলিন পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। বুঝি, সমস্ত অপমান অনাদরকে সে একা-ই ভক্তির জাহ্নবীধারায় ধুইয়া দিবে! তমোহরণ নামিয়া গেল, তাহার কথা কয়টা মীনার বুকের ভিতর বড় কাতর ব্যথার সৃষ্টি করিল।

* * *

কাশী হইতে মীনা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। একটা কথা জানা আমার নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে; অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন কি? আপনি কি গত

ভাদ্রের মাঝামাঝি একদিন লেক্‌-রোডের কাছে বাইক্‌-চাপা প'ড়েছিলেন ? প্রণাম গ্রহণ কর্‌বেন। কাশী আমার ভাল লাগে ব'লে লক্ষ্ণৌতে দু'চার দিন থাকার পর এখানেই এসেছি ! ইতি।

প্রণতা—মীনা।

প্রথমটা চিঠিখানার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া তমোহরণ নিতান্ত বিরক্তি-বোধ করিল। ভাবিল, উত্তর দিবে না। কিন্তু, উত্তর না দেওয়াটা শিষ্টাচার বহির্ভূত হইবে ভাবিয়া শেষে লিখিল ;—

কল্যাণীয়াসু—

আপনার এই অনুচিত ঔৎসুক্য আমার ক্ষতস্থানে আর এক মুঠা ক্ষার ছিটাইয়া দিল। হাঁ, লেক্‌রোডের ধারে, শুধু তাই নয়, আপনাদের বাড়ীর কাছে, আপনারই চোখের উপর দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াছিল। আপনি জানালার কাছে বসিয়া দেখিতেছিলেন ; আমি দেখিলাম। আশা হইল, পরিচিত আপনি, সাহায্য পাইব। যখন পাইলাম না, ভাবিলাম ভুল চিনিয়াছি। পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, আমার ভুল হয় নাই। আরও জানাইতেছি, সবে মাত্র হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া দেশে ফিরিতেছিলাম ; পথে হাওড়া ষ্টেশনে আপনার অনুগ্রহ আস্বাদ করিবার আর এক দফা সুযোগ উপস্থিত হইল। সে অনুগ্রহ আমার কাছে সেই অপমানের পদাঘাত অপেক্ষাও যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছিল। তারপর আপনার পত্রখানিও আপনার অনুগ্রহের আর এক প্রস্থ নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, পুনঃ পুনঃ হতভাগ্যকে এমন করিয়া অনুগ্রহ করিবেন না। আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি।

শ্রীতমোহরণ ভট্টাচার্য্য।

চিঠিখানা পাইয়া মীনার সমস্ত অন্তঃকরণটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল।

* * *

বীণা আজকাল বড় দরদী হইয়া উঠিয়াছে। কারণে অকারণে মীনার কাছে তমোহরণের প্রসঙ্গ তুলিয়া নিজের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করে। তাহার সঙ্গে বিষয়বিশেষে মতান্তর থাকিলেও, তমোহরণের পাণ্ডিত্য, তাহার আত্মসংযম যে কোন দেশে, যে কোন যুগে, যে পূজা পাইবার যোগ্য, বীণা আজকাল দৃঢ় কণ্ঠে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মীনা তাহার কথা শুনিয়াই যায়; কোন মন্তব্য প্রকাশ করে না।

মীনার ঔদাসীন্যে ঘোষ সাহেবেরও সাহচর্য্যের উষ্ণতা কমিয়া আসিয়াছে। বীণার সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্টতা এখন জমিয়া আসিতেছে। মীনা তা'তে যেন কতকটা ভারমুক্ত হইয়াছে।

সেদিন চা'র মজলিসে ঘোষ সাহেব প্রস্তাব করিলেন, যাইবার পথে বীণাদের দেশ দেখিয়া যাইতে হইবে। সকলেই সানন্দে সায় দিলেন। মীনার আগ্রহ বা আপত্তি, কিছুই দেখা গেল না।

বীণা নায়েবকে চিঠি লিখিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। তারপর একদিন সকালের দিকে সকলে বীণাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈকালে সকলে বেড়াইতে চলিলেন পাহাড়ের দিকে; মীনা বলিল—আমার শরীরটা বেশ ভাল নাই; পাহাড়টাও একটু দূরে। আমি অতদূর না গিয়ে বরং কাছে নদীর দিক্‌টায় একটু বেড়াই; আপনারা ততক্ষণ ঘুরে আসুন।

ব্যরিষ্টার মুখার্জ্জি বলিলেন—তাই ভাল মা, একে কয়দিন থেকেই তোর শরীরটা খারাপ দেখছি ; তারপর ট্রেণের ঝাঁকুনি! তোর আর গিয়ে কাজ নেই ; কাছাকাছি একটু ঘুরে আয়। চেনা জায়গা তো তোর।

মীনা নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখিল—তমোহরণ তার নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছে। চোখচোখি হইতেই তমোহরণ নমস্কার করিল, মীনা কিন্তু কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কারের জবাব দিল না। ধীরপদে তমোহরণের নিকটে আসিয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে মাথা তুলিতেই, তমোহরণ দেখিল, মীনার চোখে জল। তমোহরণ বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে তো মীনার মনোরাজ্যের সংবাদসংগ্রহে কোনদিন বিশেষ অবহিত হয় নাই। জগতে তাহার দরদী কেউ থাকিতে পারে, এ কল্পনাকেও সে যে মনে স্থান দিতে সাহস করিত না। সে জানিত, জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে তাহাকে আসিতে হইয়াছে পৃথিবীতে, শুধু অপমানের আঘাতই সহ্য করিতে! কেউ চোখের জল মুছাইবে না, কেউ বুকের ক্ষতে প্রলেপ দিবে না, একটা সান্ত্বনার বাণীও কেউ উচ্চারণ করিবে না! পদদলিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত সে চলিয়া যাইবে, এই ব্যথাভরা জীবনের গুরুভার বহিয়া। তাই আজ এ অপ্রত্যাশিত, অযাচিত দরদ তার দেহমন আনন্দ-চঞ্চল করিয়া তুলিল।

মীনার আনমিত মুখখানি তমোহরণের বুকের নিতান্ত নিকটে, বুঝি তার তপ্ত শ্বাসের স্পর্শও তমোহরণের বুকে লাগিতেছিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল মীনার চোখের জল মুছাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু, তাহার চিরাভ্যস্ত সংযম সে চাঞ্চল্যের গতিরোধ করিয়া দিল; তমোহরণ পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, নির্ব্বাক্!

মীনার কণ্ঠটাকে কে যেন টিপিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ ধরার বক্ষ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছিল। নির্জ্জন নদীতীর; নির্ব্বাক্ দু'টি যুবক-যুবতী মুখোমুখী দাঁড়াইয়া, নতনয়ন।

মীনা এ অবস্থা বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। নীরবে বিদায়-প্রণাম করিতে তমোহরণ বলিল—আপনার এই অস্পষ্ট আচরণ আমার কাছে ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠ্ছে মীনা দেবি!

মীনা মুখ তুলিয়া চাহিল। মিনতি-ভরা সজল চোখ দু'টি তমোহরণের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বেন?

—ক্ষমা,—কি জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন!

—সেদিন দূর থেকে আপনাকে চিনে উঠ্তে পারি নি; আমারই চোখের উপর—

বাধা দিয়া তমোহরণ বলিল—আমারই ভুল হ'য়েছিল, মীনা দেবী, অভিমান ক'রেছিলাম আপনার উপর। তাই, আপনার পত্রের জবাবটা একটু শক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর, স্থির মস্তিষ্কে আমার অভিমানের দাবীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে ভাব্তে গিয়ে শুধু হাসি পেলো; আপনার জনের কাছেই অভিমান সাজে; আমি যে সারা জগতের অনাত্মীয়! ক্ষমার পাত্র আপনি ন'ন্; —অন্যায় অভিমানের দাবীতে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার ক'রেছি আপনার পত্রের জবাবে, তার জন্য ক্ষমার পাত্র আজ আমি-ই।

'অন্যায় অভিমানে'র ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গিয়া তমোহরণ নূতন করিয়া যে অভিমান করিয়া বসিল, তার স্পর্শ মীনাকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে আর দুর্ব্বলতা রোধ করিতে পারিল না; চোখের জল শ্রাবণ ধারায় তাহার বুক ভাসাইতে

লাগিল। তমোহরণের সংযমের বাঁধ এইবার ভাঙ্গিয়া গেল; কম্পিত করে মীনার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া আবেগ-কম্প্র কণ্ঠে ডাকিল—মীনা দেবী!

মীনা প্রত্যুত্তরে শুধু স্বীয় আতপ্ত ললাটখানি তমোহরণের বুকে স্থাপন করিল। দু'জনের চোখে অশ্রুর অবিরলধারা!

ব্যথার আঘাতে যাহারা পরস্পর আগাইয়া আসে—দরদভরা চোখের জলের ভিত্তিতেই তাহাদের প্রেমের অভেদ্য প্রাসাদ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

*　　　*　　　*

সায়ং সন্ধ্যা শেষ করিয়া তমোহরণ স্তোত্রপাঠ করিতেছিল। অপূর্ব্ব শ্রীতে তার মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে; নেত্র প্রান্তে দুই ফোটা স্বচ্ছ পবিত্র অশ্রু টল্‌টল্‌ করিতেছে। তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়া মীনা স্বামীর দেবভাবমণ্ডিত মুখের দিকে মুগ্ধনয়নে চাহিয়াছিল।

নিতান্ত সংক্ষিপ্তাভরণা মীনা। স্বেচ্ছায় সে এই দৈন্যবরণ করিয়াছে। পরণে একখানি লাল পাড় রেশমী শাড়ী। সন্ধ্যা-স্নানান্তে চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়াছে পিঠের উপর।

দ্বারে জুতার শব্দে পিছনে চাহিয়া মীনা দেখিল—বীণা ও ব্যারিষ্টার ঘোষ। মীনা ব্যস্ত হইয়া আগাইয়া আসিতে বীণা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—থাক্ মীনা, যেমন দাঁড়িয়েছিলি, ঠিক্ তেমনি থাক্। দেখি, ভালো ক'রে। দৈন্যকে-ও যে এত সুন্দর, এত পবিত্র ক'রে তোলা যায়, প্রেমের স্পর্শমণি ছুঁইয়ে, তা, প্রত্যক্ষ ক'রে গেলাম। ধরার ধূলিকে আজ পারিজাতের পুষ্পরেণুতে রূপান্তরিত করেছিস্, মীনা!

ততক্ষণ তমোহরণের স্তোত্রপাঠ শেষ হইয়াছে। বিনীতভাবে সে বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিল।

বীণার মনের সাগর আজ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ !

—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আজিকার এ সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্তই হলো, শাস্ত্রীমশায়। আপনার এই দৈন্য-সৌভাগ্য আমার মনে আজ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ ক'রেছে। বুঝি সুখ ও সৌভাগ্যের যুগ-প্রচলিত সংজ্ঞাকে একেবার ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌বার সময় এসেছে। আসি, মীনা। অনুরোধ করিস্ না; আজ আর বস্‌বার সময় নাই। গুরুতর একটা জমিদারী সংক্রান্ত কাজে আজ দুপুরে এখানে এসেছি; কা'ল সকালেই যেতে হবে, এখনও কাজ বাকী প'ড়ে রয়েছে। আসুন মিষ্টার ঘোষ।

বাহিরে মোটর ছিল। নমস্কার—প্রতিনমস্কারাদি শিষ্টাচারের পর্ব্ব শেষ করিয়া বীণা ও ব্যারিষ্টার ঘোষ চলিয়া গেল, যেমন আসিয়াছিল ঝড়ের মত, ঠিক তেমনিভাবে।

বীণার মনের পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে দেখিয়া মিষ্টার ঘোষ গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বীণা ভাবিতে লাগিল, কা'র ভুল !

প্রণতা মীনাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসজলনেত্রে তমোহরণ বলিল—ব্যথাও সার্থক, মধুময় হ'য়ে উঠে, মীনা, যখন সেই ভয়াল সাগর মন্থনোদ্ভূতা লক্ষ্মী উঠে আসে উপহাররূপে !

মীনার কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ পবিত্র অশ্রু ও নিবিড় আলিঙ্গন স্বামীর কথার উত্তর প্রদান করিল।

রাজা-প্রজা

চিরটাকাল সুশান্ত বাবুর বিদেশে কাটিয়াছে, কর্ম্মসূত্রে। এবার পূজার বন্ধে একবার 'মহালে' যাইবেন ঠিক করিয়াছেন। দেশ হইতে কিছু দূরে তাঁহার জমিদারী। নায়েব-গোমস্তারা-ই দেখাশুনা করিয়া থাকে। কোনো প্রজার সঙ্গেই তাঁহার আলাপ পরিচয় নাই। এবার পূজার ছুটিটা তাই 'মহালে' গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছেন।

নায়েব গোমস্তাকে দুর্গা প্রতিমা গঠন করাইবার আদেশ দিয়াছেন; এবং কাছারীতে যাহাতে সপরিবারে থাকা যায় সে বন্দোবস্তও করিতে লিখিয়াছেন। এসব ব্যাপারে তো নায়েব গোমস্তাদের আগ্রহ একটু বেশী হইবার-ই কথা। সুতরাং ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই বৈদ্যনাথপুরে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ছিটে বেড়া দিয়া চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী হইতেছে। কাছারী সংলগ্ন মাঠে ছোট ছোট সাময়িক গৃহ উঠিতেছে। গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের পুরস্কারবিহীন পরিশ্রম দিয়াই এই নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে, একথা বলা বাহুল্য। বেচারাদের দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। একে এই সময়েই তাহাদের ঘরে খাদ্যাভাব হইয়া থাকে; দিন মজুরী করিয়া যা রোজগার করে তাই দিয়া কষ্টে-সৃষ্টে পরিবার পালন করিতে হয় তাহাদের। এবার তা-ও বন্ধ হইয়া আসিয়াছে নায়েব গোমস্তার তাড়নে। ফলে, যার যা কিছু ছিল, বন্ধক দিয়া, বেচিয়া এক আধ বেলা কোনো প্রকারে চলিতেছে। দরিদ্র নিরন্ন প্রজারা তাহাদের পারিশ্রমিক না পাইলেও জমিদার তহবিল হইতে সে সমগ্র খরচা কড়াক্রান্তি হিসাবে আদায় হইয়া আসিয়া যথাস্থানে পৌঁছিবে ইহা না বলিলেও চলে।

গোমস্তা পূর্ণকাম মণ্ডল একজন 'ঢুঁদে' ব্যক্তি। জমিদারী সায়েস্তা করিতে ইহার 'জুটি' মিলে না, পার্শ্ববর্ত্তী সকল জমিদারই ইহা স্বীকার করেন। তাই সুশান্ত বাবুর 'মহালে'র গোমস্তাগিরি ছাড়া-ও অন্য কয়েকটি মৌজার আদায় তহশীল তাহার হাতে আছে। তাহার সম্পত্তি, টাকাকড়ি-ও ফাঁপিয়া উঠিয়াছে অস্বাভাবিক ভাবে। সেই এখন ছোটখাটো একটা জমিদার। নায়েব কৈলাস মজুমদারের বাড়ী গ্রামান্তরে। জমিদার বাবুর আগমন উপলক্ষ্যে এখন কাছারীতেই থাকিয়া কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেছেন। দিব্যি, প্রজাদের পুকুর হইতে মাছ ধরাইতেছেন; অ-খরচায় খাঁটি দুধ সেবন করিতেছেন; নিম্নশ্রেণীর লোকেদের বাড়ী হইতে ডিমটা আর-টাও এম্নি মিলিতেছে। কাজেই, মজুমদার মহাশয়ের বপুখানি বেশ চিকন-চাকনটি হইয়া উঠিতেছে; বসিয়া-যাওয়া গালদুটি ভিতর হইতে একটু ঠেলা মারিয়াছে। চর্ম্মসার পেটটির আশে-পাশে দু'চারিটি মৃদু মাংসল কুঞ্চনও দেখা দিয়াছে। পকেট-টাও যথাসম্ভব ভারী হইয়া উঠিতেছে। অর্থাৎ, মজুমদারের সময়টা বর্ত্তমানে চলিতেছে ভালো। আর 'মোড়ল' তো এসব রসে একটা স্থায়িভাব; সে গড়িয়া বসিয়াছে।

সুশান্তবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একটা চৌকীর দেওয়ানী আদালতে হাকিমি করেন। মহালয়ার দিন আদালত ছুটি হইয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পত্নী সুরুচি দেবী ও পুত্র প্রশান্তচন্দ্রকে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। ষ্টেশনে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিল। পাল্কী তিনখানা আসিয়াছে; মালপত্র লইবার জন্য গো-গাড়ীও আসিয়াছে খান দুই। মাল্যাদি দানের পর্ব্ব শেষ হইলে নায়েববাবু ছাতুদত্ত প্রভৃতি গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ছাতুদত্ত স্বভাববঙ্কিম ভঙ্গিমায় যথাসম্ভব শিষ্টাচার ও বিনয়

ছড়াইয়া স্বরুচি দেবীর কাছে গিয়া মাথাটি একটু নীচু করিয়া হাত কচ্লাইয়া বলিল—দয়া ক'রে পাল্কীতে উঠে বসুন,—'হিট্'-টা খুব বেশী।

স্বরুচি দেবী সংক্ষেপে জবাব দিলেন—'থাক্'।

প্রশান্তচন্দ্রের কাছে গিয়া ছাতু দত্ত বলিল—'আহা, ট্রেনজার্ণিতে কচি মুখখানি শুকিয়ে গেছে, এসো খোকাবাবু একটু 'শেডে' দাঁড়াই।

প্রশান্তচন্দ্রের 'শেডে' যাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, সে মার পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

এবার ছাতু স্বরুচিকে উদ্দেশ করিয়াও নয়,—খোকা বাবুকে উদ্দেশ করিয়াও নয়, মাতাপুত্রের মাঝখানে যে ফাঁকটা ছিল, সেইটাকেই যেন লক্ষ্য করিয়া, চোখ দুটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটু শূন্যে উন্নমিত করিয়া গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিল—ডাব! আইস্ক্রিম্! সোডা! আইস্!

সুশান্ত বাবু পাশে দাঁড়াইয়া আলাপ-পরিচয় করিতেছিলেন; ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—থাক্, থাক্।

স্বরুচিদেবীর আদেশে পাল্কী খালি অবস্থায় ফিরিয়া গেল। পুত্রের হাত ধরিয়া স্বামীর পাশে পাশে,—পুত্রাধিক প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি মমতার অমৃতধারা ছড়াইতে ছড়াইতে হাঁটিয়া চলিলেন মেঠো পথে।

গোমস্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—সর্ব্বনাশ, রোদে কি হেঁটে যাওয়া হয়! অসম্ভব।

সুশান্ত বাবু জবাব দিয়াছেন—ছেলেদের হাঁটিয়ে নিয়ে কোনো মা বাপ পাল্কী চ'ড়ে যান কি!

ছাতু ও নায়েব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছাতা ধরিতে আসিলে তিনি বলিলেন—এ দুর্ভাগ্যের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে আপনারা

এত ব্যস্ত কেন ? আর, তা'ছাড়া, এই বিকাল বেলার পড়ন্ত রোদকে অনর্থক তীব্র মনে ক'রে লাভ নেই।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া সুশান্ত বাবু বাহিরে আসিলেন। গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গ্রামের সকলের সঙ্গেই কি আমার আলাপ হ'য়েচে !

গোমস্তা বলিল—আজ্ঞে, হুজুব, সকলের সঙ্গেই প্রায় হ'য়েচে ; বাকী আছে একজন,—তার সঙ্গে বুঝি হবেও না।

—কেন ? কে তিনি ?—

—আজ্ঞে, সুরেশ উকিল তো কাছারিতে কখনো ডাকে আসে না। খাজনা দেয় মনিঅর্ডার ক'রে, না হয় আদালতে।

ছাতুদত্ত জামাই বাবুটির মত পাশে দাঁড়াইয়াছিল। নাটকীয় ভঙ্গিতে বাংলার সঙ্গে তাহার খাস নিজস্ব ইংরাজী মিশাইয়া বলিল—মোষ্ট্ উইকেড্, স্যার ! তাকে 'কল্' করুন সে 'কাম' করবে না—বাই নো মিন্‌স্ ! গ্রেজুয়েট্ যেন আর দেশে কেউ নাই, 'অন্‌লি' উনি-ই ! করেন তো 'টিচারী' ; 'স্যালারি' তো ফিফ্‌টি' তাই নিয়ে এত ? আর 'ফাদারে'র ই বা এমন কি প্রপার্টি আছে ! কতই বা আর 'মানি' জমা আছে ?

সুশান্ত বাবু সে কথার জবাব না দিয়া গোমস্তাকে বলিলেন—একবার ডাকবেন কি ?

—আজ্ঞে, আপনি যখন হুকুম করছেন,—তখন নিশ্চয়ই ডাকবো। তবে আস্‌বে ব'লে মনে হয় না।

তারপর বাহিরে গিয়া 'লগ্‌দী' উমেশ কোঁড়াকে কি সব বলিয়া পাঠাইয়া দিল।

এই অবসরে ছাতুদত্ত পকেট্ হইতে সুদৃশ্য সিগারেট্ কেস্ বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ মাখানো একখানা রঙীন রেশমী রুমাল যেন এম্‌নি-ই বাহির হইয়া আসিল; এবং নিতান্ত অমনোযোগী হইয়াই যেন ছাতু সেখানাকে পকেটে গুঁজিতেছিল; অথচ পকেটের স্থানটা নির্দ্দেশ না হওয়াতেই বুঝি সেটা পকেটে ঢুকিতে দেরী করিতেছিল।

সিগারেট কেস্‌টি খুলিয়া দেশ্লাই সহ সুশান্ত বাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ছাতু বলিল—স্যার, প্লিজ্!

সুশান্ত বাবু বলিলেন—'থাক্'।

ছাতুদত্ত ঘাড়টি বাঁকাইয়া বলিল—সিজার্স,

সুশান্ত বাবু যেন একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—ধন্যবাদ, আমি খাইনা।

ছাতু বলিল—অ! আই সি, স্মোক করেন না আপনি! গুড্।

পাশে ছাতুদত্তর কয়েকজন 'কৃষাণ' ও মাহিন্দার' দাঁড়াইয়াছিল; তাদের দেখাইয়া ছাতু বলিল—স্যার, এরা 'অল্' আমার 'সার্ভেণ্ট্' যখন আপনার যা 'নেসেসিটি' হবে, 'কাইন্ড্‌লি' ব'ল্‌বেন,—'এভ্‌রিথিং' ওদের দ্বারা 'কম্‌প্লিট্' করিয়ে দেবো। 'টু-মরো' আমি থাক্‌তে পারছিনা,—সাঁইথে যেতে হবে, হরেকচাঁদ মাড়োয়ারীর সঙ্গে একটা হাজার-দশেক টাকার সওদা আছে কিনা।

সুশান্তবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—অ!

এই অবসরে উমেশ কোঁড়া আসিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল—হুজুর মা বাপ, ডাক্‌তে পাঠালেন,—আমাকে গালাগালি দিয়ে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিলে সুরেশ উকিল।

গোমস্তা বলিল—দেখলেন হুজুর, কাণ্ডটা! আমি তো জানি-ই, এমনি কিছু একটা হবে। হুজুরের অপমান!

ছাতুদত্ত বলিল—স্যার, ওকে একটা 'লেসন্' দিতে হবে।

সুশান্ত বাবুর মুখটা অপমানে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুরুচি দেবী স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'লো, অমন ক'রে যে!

সুশান্তবাবু ব্যাপারটা বলিলেন।

সুরুচি দেবী বলিলেন—তা' কি সম্ভব!

তাই তো দেখছি।

আপন মনে সুরুচি দেবী বলিলেন—তা' হবে-ও বা। লোক চরিত্র দুর্জ্ঞেয়।

সুশান্তবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—এ ব্যাপারে তুমি কি করতে বল সুরুচি।

—সহসা কিছু না করাই ভালো, মনে হয়।—

—একটা কিছু না করলে জমিদারী তো থাকবে না! প্রজারা যখন বুঝবে, তা'দের জমিদারটি নির্বিষ সর্পবিশেষ, তখন সুরেশ উকিলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেগ দিতে ছাড়বে না।

—অবশ্য, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, করতে হয় বৈকি, তবে হঠকারিতা ক'রে একটা কিছু ক'রে বসোনা।

—তোমার বৈষ্ণবী মনোবৃত্তি এখানে খাটালে চলবে না, সুরুচি, এ রাজনীতির ক্ষেত্র, গুরুতর একটা কিছু করতেই হবে। যাতে সে-ও জব্দ হয়, প্রজারাও বুঝতে পারে।

—যা 'ভাল বোঝ' করো, তবে পূজোটা যা'ক্, তারপর যা হয় ক'রবে, এখন থাক।' বলিয়া সুরুচি দেবী ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেলেন।

ঠাকুর রান্না চড়াইয়াছে। ঝি বলিল—মা, আপনার রান্নার জোগাড় ঠিক করা হয়েছে ও-ঘরে, আসুন।

সুরুচি দেবী স্বামী পুত্রকে পরের হাতে খাইতে দেন না; নিজে রান্না করেন। অন্যান্য সকলের জন্য ঠাকুর রাঁধে।

পূজায় মহা ধূম লাগিয়া গিয়াছে। গান-বাজনা, আমোদ উৎসব, দীয়তাং ভুজ্যতাম্, কিছুরই ত্রুটি নাই। অজস্র লোক খাওয়ানো চলিতেছে। গ্রামের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে; বহির্গ্রামের রবাহুতের সংখ্যাও কম নয়। কেবল বাদ আছেন সুরেশ উকিল।

সুরুচি দেবী বলিয়াছিলেন, নিমন্ত্রণটা ক'রে দিলেই হ'তো! সুশান্ত বাবু মত করেন নাই।

মহানবমী। পূজার উঠানে মাঝখানে সুরেশ উকিলের বৎসর আটের পুত্র নিমাই দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামের সব ছেলেই ঠাকুর দেখিতে যায়; তারও মন ছট্‌ফট্ করে ঠাকুর দেখার জন্য। কিন্তু, অপমান করিবার উদ্দেশ্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই জমিদার বাবু, সুতরাং নিমাইএর মা বাপ ছেলেকে এযাবৎ আসিতে দেন নাই। আজ সে মনের 'আটু-বাটু' দমন করিতে না পারিয়া, এক ফাঁকে পলাইয়া আসিয়াছে। তার মনে হইয়াছে, একবারটি ঠাকুর দেখিয়াই চলিয়া আসিবে, বাবা মা জানিতেই পারিবেন না।

ভোগ ঘর হইতে লুচি ভাজিয়া পুরোহিত একটা গামলায় কলাপাতা চাপা দিয়া ঠাকুর ঘরে আনিতেছিলেন। মাঝখানে নিমাই দাঁড়াইয়াছিলেন। পিছন হইতে পুরোহিত হাঁকিতেছিলেন,—এই, সর্ সর্। নিমাই সরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া এধার ওধার করিতে করিতে পুরোহিতকেই ছুঁইয়া ফেলিল। পুরোহিত ঠাকুর রাগিয়া লুচির

গামলাটা ঠক্ করিয়া সেইখানেই নামাইয়া দিয়া নিতান্ত অ-রস কণ্ঠে বলিলেন—আবার আমাকে চান ক'রে লুচি ভেজে নিতে হবে; এই হতভাগাটার জ্বালায়। এ লুচি মাকে দেওয়া যায় না।

পাশে মোড়ল গোমস্তা ও ছাতু দত্ত দাঁড়াইয়াছিল। ছাতু ক্রোধে অশ্রাব্য ভাষায় নিমাইকে গালাগালি করিল; মোড়ল নিমাইএর একটা বাহুমূলে ধরিয়া এক ঝাঁকানি দিয়া পাশে ডোম মুচির ছেলেরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল! নিমাই কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরুচি দেবী ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসিয়া পূজা দেখিতেছিলেন; তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া নিমাইকে কোলে লইলেন। নিমাইএর দুঃখ দ্বিগুণ হইল, সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার রোদনে সুরুচি দেবীর মাতৃ-হৃদয়টা মোচড় দিয়া উঠিল; তাঁহারও চোখে জল আসিল। চোখ মুছাইয়া ও মুছিয়া সুরুচি দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাদের ছেলে, বাবা।

নিমাই কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মপরিচয় দিল।

সুরুচি দেবী স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, তুমি এইখানে ব'সো বাবা, আমার ছেলে প্রশান্তর সঙ্গে খেলা করবে, পূজো দেখ্‌বে, প্রসাদ পাবে, বেশ!

'বাবা বকবেন' বলিয়া নিমাই যাইবার জন্য দাঁড়াইল। সুরুচি দেবী আট্‌কাইলেন না, নিমাই চলিয়া গেল।

বিজয়ার পরদিন বিকালে সুরুচি দেবী ডাঙ্গা দিয়া বেড়াইতে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ছাতু দত্তর স্ত্রী ও মোড়ল গোমস্তার 'মোল্লানী' সঙ্গিনী হইল। রাণীমাকে ঘিরিয়া গদগদ কণ্ঠে স্তুতিগাথার বান ডাকাইতেছিল, সঙ্গিনীদ্বয়। খানিকটা জমি পার হইয়া ডাঙ্গায়

উঠিতে হয়। মেঠো সঙ্কীর্ণ পথ। বৈকালিক স্নানান্তে সুরেশ বাবুর স্ত্রী নমিতা ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। সুরুচি দেবী মুখোমুখি আসিয়া পড়ায় সঙ্কোচে সরু পথের একপাশে দাঁড়াইতে গেল নমিতা। সুরুচি দেবীরও সরিবার উপায় নাই; একপাশে জলভরা নালা, অন্য দিকে কর্দ্দমাক্ত ধান জমি। ব্যস্ততায় কতকটা জল চল্‌কাইয়া নমিতার ঘড়া হইতে সুরুচিদেবীর পায়ের কাছে পড়িয়া যাওয়ায় খানিকটা ধূলা কাদা-মাখা জল তাঁহার পায়ে ও শাড়ীতে লাগিয়া গেল। সুরুচি দেবী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আঃ! ছাতুর স্ত্রী ও 'মোল্লানী' অধিকন্তর বিরক্তি দেখাইয়া মন্তব্য করিল,—চোখ তো আছে, স'রে গেলে কি 'মাহাত্মি্য' ক্ষয় হ'য়ে যেতো! এত দেমাক কিসের! আমাদের রাণীমার পায়ের ধূলোর যুগ্যি হ'লেও না হয় হ'তো!

নমিতা কিছু না বলিয়া, সসঙ্কোচ অপ্রতিভতায় মুখখানি নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

সুরুচি দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মেয়েটা কি খুব বেশী অহঙ্কারী? কে ও?

মোল্লানী নাকটা তুলিয়া ঠোঁট দুটো বিকৃত করিয়া বলিল—ঐ বড় ঠাকুর উকিলের 'চি' (সুরেশ ছিল তার ভাসুরের নাম, সুতরাং সে নাম করিতে তো পারে না; আর 'স্ত্রী'—উচ্চারণের ভঙ্গিতে 'চি' রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে)।

সুরুচি দেবী মুখ ফিরাইয়া উচ্ছ্বসিত হাসি গোপন করিলেন। আর তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় নমিতার অজস্র দোষ বর্ণন করিয়া চলিল।

রাত্রে কথা প্রসঙ্গে সুরুচি দেবী সুশান্ত বাবুকে নমিতার ব্যবহার বলিলেন—সুশান্তবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখ সুরুচি, জগতে

ভালো ব্যবহার করলেই, ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না। আমার কিন্তু, ধারণা ছিল উল্টো। সুরেশবাবু অকারণে আমার 'লগ্‌দী'কে অপমান ক'রে আমার-ই অপমান করেছেন। অথচ, তুমি তো জানো,—কেন আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সদ্ব্যবহারে তাঁকে আত্মীয় ক'রবো, এই তো ছিল আমার ইচ্ছা। অথচ, তিনি দেখালেন মেজাজ। তোমার উপর তাঁর স্ত্রীর আজকার ব্যবহারও স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাঁরা আমাদের অবজ্ঞা করতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুরুচি দেবী আনমনে ভাবিতে লাগিলেন; সুশান্তবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

৩

পূজার পর প্রজাদের খাজনার তলব দেওয়া হইয়াছে জোর।

প্রজাদের ঘরে খাইতে নাই; তার উপর পূজা গেল। দু'চার আড়ি আউশ ধান যা' হইয়াছিল, পূজায় ফুরাইয়া গিয়াছে। এদিকে জমিদার বরাবর কার্য্যতৎপরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উগ্রতা প্রতিপাদন মানসে নায়েব ও গোমস্তা প্রজাদের উপর কড়া শাসন চালাইতেছে। জমিদারবাবুকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে প্রজা মাত্রেই বদমাইস। সংসারের সব খরচ চলে অথচ 'রাজকর' দিবার বেলায় কাঙাল সাজে!

প্রজাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে রাঙা চোখ দেখাইয়া,—যে জমিদার কখনো 'মহালে' আসেন নাই, এই প্রথম; সুতরাং খাজনা তো দিতেই হইবে, প্রণামী ইত্যাদিও অবশ্য দেয়। না দিলে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবেন জমিদার। প্রজারা ভয়ে যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে প্রণামীও খাজনাদি জোগাড় করিতেছে।

কারো রুগ্ন শিশু পুত্রের মুখে ছাই দিয়া সামান্য মূল্যে দুধেল গাই

আসিয়া ছাতুর দুধের কেঁড়ে ভর্ত্তি করিতেছে। কারো বা 'বাজুতাবিজ' 'বাসনকোষন' মোড়ল গোমস্তার সিন্দুকের কুক্ষি ভরিতেছে। এই ভাবে সমস্ত প্রজার খাজনাদি উশুল হইতেছে। সুরেশ উকিলের তো সর্ব্বনাশের-ই জোগাড় চলিতেছে।

আজ সন্ধ্যায় সুশান্তবাবু সমস্ত প্রজা কাছারীতে ডাকিয়াছেন। সুরেশ উকিল ছাড়া সকলেই আসিয়াছে। সুশান্তবাবু গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি, অর্থ নৈতিক সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা করিতেছেন; মাঝে মাঝে ভগবৎ প্রসঙ্গও হইতেছে। কিসে গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধে দু'একটা মূল্যবান্ উপদেশও দিতেছেন নায়েব, গোমস্তা এবং ছাতুবাবু;—যথা রাজার খাজানা সর্ব্বস্ব বেচিয়াও শোধ করিলে সব আপ্‌সে হইয়া যাইবে ইত্যাদি।

প্রশান্তচন্দ্রের হাত ধরিয়া সুরুচি দেবী কাছারীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু আগে একজন কাঙাল প্রজার কাছে নায়েব গোমস্তার জুলুম জবরদস্তির কথা শুনিয়াছেন।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। সুশান্তবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

সুরুচিদেবী প্রশান্তের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—আমার কাছে প্রশান্ত-ও যা' আমার প্রজারা-ও তাই। মা কখনো এক ছেলের সুখ-সুবিধার জন্য আর এক ছেলের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করেনা। তারপর গোমস্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনাদের সেরেস্তায় সকলের বাকী শোধ হ'য়ে গিয়েছে তো!

গোমস্তা ঘার নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে সুরুচিদেবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, সকলকে খাড়া রসিদ কেটে দিন।

তার পর প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—তোমরা বাবা মনে কিছু

করোনা ; তোমাদের মা বড় লোক নয়। তবে, তার সামান্য দান গ্রহণে আপত্তি করো না।

গোমস্তার দিকে ফিরিয়া হুকুম করিলেন,—যার ঘর থেকে যা এনেছেন ফিরিয়ে দিন। কে আপনাদের ব'লেছে, প্রজাদের গরু, বাসনকোষন, গয়নাগাঁটি আন্‌তে!

গোমস্তা মাথা চুলকাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে লাগিল।

স্বরুচিদেবী বলিলেন—ভয় নাই, আপনাদের টাকার দায়ী করবোনা।

গোমস্তা বলিল,—'আজ্ঞে, মা, এমন ক'রলে জমিদারী রক্ষা করা যাবে না।

এতক্ষণে স্বশান্তবাবু যেন একটা কিনারা পাইলেন ; এ যাবৎ পাথারে-ই ভাসিতেছিলেন। তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—জমিদারী না থাকে, যাবে আমার ; সে ভাবনায় আপনার আপাতত প্রয়োজন নাই। ফিরিয়ে দিন, যার যা এনেছেন ; আর রসিদ দিয়ে দিন। এক্ষুণি আমার সাক্ষাতে।'

অগত্যা নায়েব গোমস্তাকে হুকুম তামিল করিতে হইল।

এই অকৃত্রিম দরদের নিবিড়-স্পর্শে দুঃস্থ প্রজাদের চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। গোমস্তা ও ছাতুদত্তর মুখ হইল হাঁড়ির মতন। আর, মজুমদার মহাশয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ; একটা ঢোক গিলিয়া মনের আসলরূপটি চাপিয়া ছোট ছোট দুটি চোক 'পিটি-পিটি' করিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন—অহো! তারা, তারা, জগদম্বা!

রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় পথে মোড়ল-গোমস্তা ছাতুকে বলিল— বুঝ্‌লে ছোটদত্ত, আর দু'চার বছরের বেশী 'যাদু'কে জমিদারী রাখ্‌তে হবে না।

'ছোট দত্ত' পরমবিজ্ঞতাসহকারে বলিল—সিওর্‌লি—এত 'ফুলিশ' লোকের জমিদারী থাকেনা।

সুশান্তবাবু হাকিমী করিয়া মোটা-বেতন পান; সম্পত্তির আয়-ও আছে। কিন্তু, থাকিলে কি হয়! কায়ক্লেশে সংসার চলে মাত্র। দানখয়রাতে সব-ই যায়। সুরুচিদেবীও জুটিয়াছেন তেমনি; স্নেহদয়ার ভাণ্ডার উজার করিয়া বিধি এই মাতৃমূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। হরিনাম, ভাগবত, দানধ্যান,—বেশ দিন কাটে দু'জনের; যেন পথ ভুলিয়া দুটি বৈকুণ্ঠের বাসিন্দা ধরার ধূলায় আসিয়া পড়িয়াছেন।

ছুটি ফুরাইলে প্রজাদের চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া সুশান্তবাবু কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। যাবার বেলা বিদায়ের দুঃখকে ছাপাইয়া একটা বেদনা সুশান্তবাবুর মনে বড় হইয়া উঠিতেছিল—তাঁর-ই প্রজা সুরেশবাবু তাঁকে এমনি করিয়া অবজ্ঞা করিলেন! তিনি তো কোনো দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই তাঁর উপর। সুরুচি দেবীর মনে-ও এই ব্যথা-টা কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

সুরেশবাবুর প্রসঙ্গ উঠিলে প্রশান্ত বলিল—উকিলদের নিমাই কি সুন্দর হরিনাম গায় মা! সে দিন নদীর ধারে একা ব'সে গাচ্ছিল, আমি গানটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছি; শুন্‌বে মা!

প্রশান্ত আপনমনে গাহিতে লাগিল—

কোথা হরি ব্যথাহারী কেঁদে মরি এলেনা তো,
বুঝি হয়নি ডাকা দীনের সখা তাই কি বাঁকা হ'লে এতো!
হরি ডাকৃতে আমি জানিনা যে
শিখিয়ে দাও এসে নিজে
তুমি আপন ক'রে গড় মোরে কর তোমার মনের মতো!

সুরুচি দেবীর চোখ দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল; স্বামীকে বলিলেন

— একটা খটকা আমার মনে বড় বাধছে ; এমন শিক্ষা সংস্কার যে ছেলের, তার মা বাপ কি এতটা—

সুশান্ত বাবু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—কিন্তু, দেখে তো এলে সব ব্যাপার নিজের চোখে !

সুশান্তবাবুরা চলিয়া গেলে একদিন সুরেশ বাবু নমিতাকে বলিলেন বড় দুঃসময় চলছে নমিতা, নইলে এমন দেবোপম জমিদারও আমাদের উপর বিরূপ ! একটা কথা কয়েকদিন থেকেই ভাবছি। দেখ গ্রামের লোকের উপর আমার একটা প্রভুত্ব ছিল। এমন দেবস্বভাব জমিদারকে আমার উপর বিরক্ত দেখে তারাও আমাকে এড়িয়ে চল্‌তে লেগেছে। আর এটা অস্বাভাবিকও নয়। এ অবস্থায় এখানে থাকা কি সম্ভব! সে দিন নূতন গ্রামের জমিদার ভবদেব বাবু বলছিলেন,— তাঁর জমিদারীতে বাস করতে। তুমি কি বল !

নমিতা দুঃখিত হইয়া বলিল—তুমি যা' ভালো বোঝ'। বাপ-ঠাকুর্দ্দার ভিটে,—দেখ যাতে ভালো হয় !

সুরেশবাবুর একটা প্রতিপত্তি ছিল গ্রামে ; এবং তা' পিতৃক্রমাগত। টাকা কড়ি আছে,—ভূসম্পত্তিও আছে। সাধারণের অভাব অভিযোগও যথাসাধ্য দেখিতেন। গ্রামের বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা তাঁহারই কাছে হইত। গ্রামের হঠাৎ-বাবু রাতারাতি জগৎশেঠ ছাতুর তা' কি সহ্য হয় ! সে লাগিল গ্রামের লোককে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্‌কাইতে। সুরেশবাবুর প্রতিটি কাজে সে বাধা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সুরেশবাবুর সুপ্রতিষ্ঠিত সম্মানের বিশেষ হানি করিতে পারিল না। মোড়ল-গোমস্তাও ভয়ে উকিলমশায়ের খাতির করিয়া চলিত। এখন ছাতুকে দোসর পাইয়া সে-ও স্বমূর্ত্তি ধরিল। দু'চারজন লোককে

উত্তেজিত করিয়া তাহারা গ্রামে একটি ছোট দল তৈরী করিল। সুরেশবাবুর খাজনা বন্ধ করিয়া জমিদারবাবুকে ভুল বুঝাইয়া নালিশের হুকুম আদায় করিল। শেষে জমিদারবাবু যখন 'মহালে' আসিলেন, দুই দোস্তে যুক্তি করিয়া লগ্‌দীকে শিখাইয়া পড়াইয়া সুরেশবাবুকে ডাকিতে পাঠাইল। 'লগ্‌দী' গিয়া রুক্ষ মেজাজ দেখাইয়া বলিয়াছিল—'আভি' কাছারীতে হাজির হ'তে হবে, গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।' ক্রোধে অন্ধ হইয়া সুরেশবাবু গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেন ছোটলোকটাকে। এইরূপে মোড়ল-গোমস্তা ও ছাতুদত্তর মঙ্গল হস্তের স্পর্শে ব্যাপারটা অবাঞ্ছনীয় ভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রাজার সঙ্গে,—জমিদারের সঙ্গে,—প্রজার বিরোধ বাধিয়া উঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনি করিয়া।

সুরেশবাবু ভবদেববাবুর জমিদারী নূতন গ্রামে উঠিয়া গিয়াছেন। গ্রামখানিতে ভদ্রলোকের বাস একেবারেই নাই; সুতরাং সুরেশবাবুর মত শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে প্রজারূপে পাইয়া ভবদেববাবু সুখীই হইয়াছেন। নূতন গ্রামের লোকেরাও বাঁচিয়া গিয়াছে সুরেশবাবুকে মুরুব্বি পাইয়া। সুরেশবাবুর চেষ্টায় ইতিমধ্যেই গ্রামে একটি টিউব ওয়েল হইয়াছে; রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও পরিসর হইয়াছে; বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলায় গ্রামের শ্রী ফিরিয়াছে। সন্ধ্যার মজলিসে পরচর্চ্চা উঠিয়া গিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও জীবনসমস্যাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় নানান জল্পনা আরম্ভ হইয়াছে।

সুরেশবাবু ইচ্ছা করিলে যে বৈদ্যনাথপুরে সদর্পে থাকিয়াই ছাতুদত্ত এবং মোড়ল গোমস্তাকে নিজের প্রভাব অনুভব করাইতে না পারিতেন, এমন নয়। কিন্তু, ধর্ম্মপ্রাণ, শান্তিপ্রিয় লোক তিনি; তাই প্রৌঢ়

বয়সে ঝঞ্ঝাট বাড়ানো অপেক্ষা সরিয়া পড়ার দিকেই তাঁহার মন ঝুঁকিয়া ছিল।

পল্লীগ্রামের দরিদ্র প্রজারা প্রায়ই সালতামামি. খাড়া রসিদ লইতে পারেনা। যেমন জোটে নায়েব গোমস্তার তাড়নায় এম্‌নি দু'চার টাকা দেয়। সেটা 'আমনতে' জমা থাকে। আর এই 'আমানত' সম্বন্ধে নায়েব গোমস্তার একটু সুনাম সর্ব্বত্রই। মাঝে মাঝে সেই 'আমানতী' টাকা 'গাপ' করিয়া বেচারা প্রজাকে মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ সাজাইয়া গোমস্তা 'মহারাজ' স্বয়ং সাধু হইয়া দাঁড়ান।

সুশান্তবাবুকে চিনিয়া লইয়া ছাতু ও গোমস্তা দু'জনে মিলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। নায়েব মজুমদার মহাশয় 'ত্বরা জগদম্বার নাম স্মরণ করিয়া দূরে থাকিয়া সঙ্গোপনে মন্ত্রণা জোগাইতে লাগিলেন তিনি অবশ্য 'শূন্য বখরাদার', এক কালীন কিছু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই প্রকার বন্দোবস্ত রহিল।

প্রজাদের কাছ হইতে যে সব আংশিক আদায় হইয়াছিল, তাহা আমানত আছে; অর্থাৎ সে টাকা গোমস্তার মায়া রজ্জুতে ঝুলিতেছে! প্রজারা রসিদ তো' পায়-ই নাই। গোমস্তা গিয়া সুশান্তবাবুকে জানাইল,—তিন-চার বৎসর খাজনা আদায় নাই। প্রজারা গরীব, তার উপর অজন্মা। বৎসরান্তে যে টাকা কালেকটরীতে দাখিল করিতে হয়, হুজুরের অনুমতি ক্রমেই তাহা ছাতুবাবুর কাছ হইতে ধার করিয়া সে দাখিল করিয়াছে। এখন ছাতুদত্ত টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। এদিকে খাজনা একপয়সা আদায় নাই; 'লাটবন্দী'র টাকা দাখিলের সময়ও আসন্ন। নিরুপায় হইয়াই সে 'হুজুরের' চরণে শরণ লইয়াছে। রাখা বা

মারা হুজুরের ইচ্ছা। ছাতুবাবুর কাছে দু'হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট হইয়াছে। সে এতো টাকা আর হ্যাণ্ড্‌নোটে রাখিতে চাহেনা।

শেষে ছাতুদত্তের সঙ্গে একটা মীমাংসা হইল। আরো কিছু টাকা লইয়া 'মহাল' মর্টগেজ দেওয়া হইল ছাতুদত্তর কাছে।

আরো দুই বৎসর গেল ; টাকা আরো ফাঁপিয়া উঠিল। ছাতুদত্ত নালিশ করিল। সুশান্তবাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া জমিদারীর মায়া কাটাইতে প্রস্তুত হইলেন। 'মহাল' হইতে আয় সুশান্তবাবুর বিশেষ হইতনা। নায়েব গোমস্তাই শুষিয়া খাইত। তবে, পৈতৃক সম্পত্তি,—আর জমিদারী একটা সম্মান। কিন্তু আর উপায় নাই। সুরুচিদেবী চোখের জল ফেলিয়া বলেন—'আমার প্রজার বড় কষ্ট হবে।' সুশান্তবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া জবাব দেন,—'আর 'আমার প্রজার' কেন, সুরুচি। ও মায়াটা কাটাও।' প্রজাদের উপর আত্মীয়তা বোধ সুশান্তবাবুরও কম নয়। সুতরাং চোখের জল তাঁহারও বাধা মানে নাই। দীর্ঘশ্বাস কম্পিত কণ্ঠে সুরুচিদেবী বলেন—এ বুঝি সুরেশ বাবুর অভিশাপ!

—হয় তো তাই,—কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় এটা আশীর্ব্বাদ-ই।

সুশান্তবাবুও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তিনি এখন নায়েব গোমস্তা ও ছাতুদত্তর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছেন।

সেদিন সুরেশবাবু সুরুচিদেবীকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—আজই নিলামের দিন সুরুচি।

—আজ-ই!

সুরুচিদেবীর বুকে একটা বেদনার মহাসাগর বিক্ষোভ তুলিল। তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না।

রদিন সুশান্তবাবু আহ্নিকের ঘরে বসিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত দেখিতে

ছিলেন। প্রশান্ত তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য গীতা মুখস্থ করিতেছিল। সুরুচিদেবী পূজা শেষ করিয়া উঠিলে চাকর সংবাদ দিল—মফস্বলের এক ভদ্রলোক হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চান। সুশান্তবাবু নীচে নামিয়া আসিতে ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া 'আমি আপনার একজন হতভাগ্য প্রজা' বলিয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে গেলেন।

'হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি!' বলিয়া সুশান্তবাবু পিছাইয়া গেলেন। তারপর হাতে ধরিয়া ভদ্রলোককে একটা চেয়ারে বসাইয়া নিজে পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া বলিলেন—আমি তো আপনাকে চিন্‌তে পার্‌ছি না;—কোত্থেকে আসচেন!'

'আমার পূর্ব্ব বাস বৈদ্যনাথপুরে, আমিই আপনার বিপ্রিয়ভাজন সুরেশ উকিল।

সুশান্তবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আপনি! তারপর একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু, আমি তো আর আপনার জমিদার নাই,—আপনিও আর আমার প্রজা নন! কাল'ই সব শেষ হ'য়ে গেছে।

সুরেশবাবু পকেট হইতে একটা রসিদ বাহির করিয়া সুশান্তবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—আজ্ঞে না, শেষ হয় নাই।

সুশান্তবাবু দেখিয়া অবাক হইয়া সুরেশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—ব্যাপার খুলে বলুন। আমার নামে এত টাকা কে জমা দিল!

সুরেশবাবু বলিলেন—পরে কেউ দেয় নাই, এ টাকা আপনার প্রজার,—সুতরাং আপনার-ই।

—কিন্তু, এ অনুগ্রহ আমি নিতে যাবো কেন?

—এটাকে আপনি অনুগ্রহ ব'ল্‌চেন কেন?

—সুরেশবাবু, তর্ক যুক্তি ছেড়ে দিন। এ দান গ্রহণে অক্ষম,—আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

সুরেশবাবু নত বদনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিলেন—আমি মনে করতাম, আপনি প্রজাদের সত্যই পুত্রাধিক স্নেহ করেন। আমি কি ভুল বুঝেছি!

সুশান্তবাবু কথা কহিলেন না। সুরেশবাবুর মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—আর, জমিদারী আমরা রেখেছি, আপনার স্বার্থের জন্য নয়, আমাদের-ই জন্য। অন্য কারো হাতে 'মহাল' গেলে আপনার পুত্রকল্প প্রজাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকতো না।

—কিন্তু, যাই বলুন সুরেশবাবু, এ হ'তে পারে না। এ দান আমি নিতে পারলাম না।

—আপনি বারে-বারে 'দান' বল্‌ছেন কেন? পুত্র পিতাকে দান করে না।

—তাহ'লে-ও সুরেশবাবু, আমায় মাফ করুন, যিনি টাকা দিয়েছেন 'মহাল' তাঁর-ই। আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবো না।

সুরেশবাবুর চোখ দিয়া জল আসিল। ধীরে ধীরে বলিলেন—যদি পূর্ব্বে কোনো অপরাধ-ই ক'রে থাকি, তার জন্যে কি চিরদিনই শাস্তি দিতে হয়।

—হাঁ, সুরেশবাবু, শাস্তি প্রয়োজন বৈ কি।

পর্দ্দা ঠেলিয়া সুরুচি দেবী ঘরে ঢুকিলেন।

সুশান্তবাবু বলিলেন,—দেখ সুরুচি, সুরেশবাবু আবার কি একটা কাণ্ড ক'রে ব'সে আছেন।

সুরেশবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—মা, এ দেবীমূর্ত্তি চোখে

দেখবার সৌভাগ্য, পূর্ব্বে আমার হয় নাই ; কিন্তু কানে শুনে মানস পূজা চিরদিন-ই ক'রে এসেছি। বিজ্ঞাপনের এ সময় নয়,—একটা কথা আমায় জানিয়ে দিন,—মা-ও কি বাবার মত ছেলেকে পর পর ভাবেন!

—না। পুত্রের স্নেহের দান মা চিরদিন অবিচারে-ই গ্রহণ ক'রে থাকে। আপনার এ দান মাথা পেতে গ্রহণ করলাম।

বিরক্ত হইয়া সুশান্তবাবু বলিলেন—ওকি ব'ল্‌চো, সুরুচি! ছেলে-মানুষী ক'রো না।

এ বিরক্তি সুরুচি দেবীর বুকে শেলের মত বিঁধিল।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন—কা'ল যখন থেকে শুনেছি নিলামের কথা, আমি খাই নাই, ঘুমাই নাই, শুধু ভগবান্‌কে ডেকেছি। আমার ছেলেদের কাছ থেকে আমাকে এম্‌নি হ'য়ে পৃথক্ হ'য়ে পড়তে হবে! ছেলেকে ছেলে ব'লবার অধিকার পর্য্যন্ত থাক্‌বে না! ওগো, তোমার পায়ে ধরি, এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না!

সুশান্তবাবু বলিলেন—এই ভাবপ্রবণতা ছেড়ে দিয়ে একবার ভেবে দেখ দেখি, কোন্ মুখে তোমার প্রজাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে? লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়্‌বে না?

—না গো না, আমার তা' পড়্‌বে না। ছেলের কাছে যেতে কোনো অবস্থাতে-ই মা'র লজ্জা করে না। এক কাজ কর' না; টাকাটা ঋণ হিসাবে নিলে-ই তো হয়।

সুশান্তবাবু বলিলেন,—তা' হয় বটে, কিন্তু সে তো আর একবার আত্ম প্রতারণা করা। এর আগে ও তো তা' একবার ক'রেছিলাম। ঋণ শোধ যাবে না সুরুচি। তার চেয়ে ও সুরেশবাবুর-ই থাক্। ওঁর হাতে-ও তোমার ছেলেদের কোনো কষ্ট হবে না!

সুরেশবাবু জোড় হাতে বলিলেন—মা, আমার প্রায়শ্চিত্ত এখনো

বাকী আছে! বড় আশা ক'রে এসেছিলাম, আমার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন।

সুশান্তবাবু বলিলেন—সুরেশবাবু, এখন নায়েব গোমস্তাদের চক্রান্ত সব শুনেছি। আপনার কিছু অন্যায় হয় নাই; না বুঝে অপরাধ করেছি আমি-ই। এবং আমার এই মনস্তাপ সেই অপরাধের ফল।

সুশান্তবাবুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

—সত্যি-ই আমার অপরাধ হ'য়েছিল; যত বড় রূঢ় কথা-ই বলুক আপনার লগ্‌দী, আমার উচিত ছিল, আপনার কাছে গিয়ে ব্যাপার জানা। তা' না ক'রে আপনার লগ্‌দী'র অপমান ক'রে আপনার-ই অপমান করেছি। এ বিনয়ের বিজ্ঞাপন নয়, সত্যি-ই আমার অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা করবেন না কি!

বলিয়া সুরেশবাবু থপ করিয়া সুশান্তবাবুর দুটি হাত ধরিয় ফেলিলেন।

সুশান্তবাবু করেন কি, করেন কি' বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুরুচিদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন।

সুরুচিদেবী সুরেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনাকে ক্ষমা করবার আগে পূর্ব্ব অপরাধের জন্য আপনার কিছু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আপনাকে যথা সম্ভব শীঘ্র বৈদ্যনাথপুরে উঠে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, জমিদারীর ভার আপনাকে নিতে হবে। আপনার টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের হাতে এক কাণা কড়িও আপনি দিতে পারবেন না। আর, আমার প্রজাদের সুখে রাখতে হবে, এ কথা আপনাকে বলাটাই ধৃষ্টতা হবে।

এতক্ষণে সুশান্তবাবু পথ পাইলেন; বলিলেন—হাঁ, তা' হ'তে পারে বটে।

সুরেশবাবু বলিলেন—কিন্তু, আমারও দু'একটা সর্ত আছে। পূজার সময় প্রতি-বৎসর মহালে আপনাদের যেতে হবে এবং সেইখানেই পূজো করতে হবে। আর এই সাম্‌নের বড়দিনের বন্ধে গিয়ে দীনের কুটিরে পায়ের ধূলা দিয়ে আসতে হবে।

সুরুচি দেবী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাই হবে, না কি গো!

সুশান্ত বাবু সম্মতি দিলেন।

সুরুচি দেবী বলিলেন—কিন্তু, যাবো আপনার বৈদ্যনাথপুরের বাড়ীতে, মনে থাকে যেন!

সুরেশ বাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

* * * *

নমিতা বৈকালিক স্নান সারিয়া জলের ঘড়া কাঁখে লইয়া ফিরিতেছেন, সুরেশ বাবু সুশান্ত বাবুদের লইয়া আসিলেন। পশ্চাতে বৈদ্যনাথপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা। তাহারা জমিদার বাবুকে বলিতেছিল—হুজুর, এই সুরেশ বাবু নিজের যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, আপনাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন, নইলে আজ ছাতু আর মোড়ল মিলে আমাদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতো!

সুশান্ত বাবু বৈঠকখানায় বসিলেন। নমিতা পুত্র নিমাইকে বলিলেন—'ওঁদের বাড়ীতে নিয়ে আয়।'

নিমাই গিয়া সুরুচি দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল—বাড়ীর মধ্যে চলুন। তারপর প্রশান্তর হাত ধরিয়া 'আসুন' বলিয়া, প্রায় টানিয়াই বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুরুচি দেবী বাড়ীর উঠানে আসিতেই নমিতা জলঘড়াটা সুরুচি দেবীর পায়ে ঢালিয়া দিল।

সুরুচি দেবী কৃত্রিম ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—আবার! রাণী-মার গায়ে জল দেওয়া হচ্ছে!

নমিতা মৃদু হাসিয়া 'অন্যায় হয়েছে' বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে পাদুটি মুছাইয়া দিল।

সুরুচি দেবীর চোখ দিয়া তখন অজস্র অশ্রুধারা গড়াইতেছে।

নমিতা একখানা মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। সুরুচি দেবী লক্ষ্য করিলেন, নমিতা নিরাভরণা। একনিমেষে তিনি সব বুঝিতে পারিলেন।

তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বসাইয়া বলিলেন—এমন সোনার প্রতিমা কি নিরাভরণা থাকে মা, ছি!

তারপর নিজের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া নমিতাকে পরাইয়া দিলেন।

তখন ঠাকুরঘর হইতে সুশান্ত ও নিমাইএর সম্মিলিত মধুকণ্ঠ ঝঙ্কার তুলিতেছিল—

কোথা হরি ব্যথাহারী কেঁদে মরি, এলে না তো!

কালো

কালো ছিল ভট্‌চায্যি-বাড়ির রাখাল। সে যখন ছয় সাত বছরের, তখন হইতে 'বাগালি' করিতেছে ভট্‌চায্যি-বাড়ি। আজ তাহার বয়স হইয়াছে চৌদ্দ-পনর।

কাজ তার সকালে গরু কয়টি বা'র করিয়া গোয়াল কাড়া; তারপর এক পোঁটলা মুড়ি ও ছিলিম কয়েক 'তামুক' লইয়া গরু কয়টি মাঠে ছাড়িয়া লইয়া যাওয়া। 'তামুক' তার দিনের মাথায় দশটা ছিলিম-ও চাই,—আর মুড়ি অন্ততঃ তিন পোঁট্‌লা খাবে সে দিনে।

দুপুর বেলা গরু চরাইতে চরাইতে 'তামুক' ফুরাইয়া গেলে সে মনিব বাড়ির সদর দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দুধারের বাজুতে দুটি হাত রাখিয়া ঘাড়টা বাড়ির দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়া উঁকি মারিতে থাকে। কাহাকেও দেখিতে না পাইলে মৃদু কণ্ঠে ডাকে—আমাকে খানিক জল দাওতো গো।

বাড়ির মেয়েরা জানে, জল চাওয়াটি, তা'র ছল করা; চাই 'তামুক'। পুরুষদের ভয়ে সে 'তামুক' চাহিতে পারে না। মেয়েছেলেরা জানে, সে নিতান্ত 'তামুক-কুলে'; একদণ্ড তামুক না পেলে পেট ফুলে যাবে তার। পুরুষ মানুষ কেহ বাড়িতে থাকিলে মেয়েরা জল দিবার সময় লুকাইয়া তামাক দিয়া যায়।

মেয়েছেলের উপর প্রভুত্ব তার চরম। সময় সময় তাহাদের সঙ্গে সে বেশ শাসনের স্বরেই কথা কয়। মাঝে-মাঝে, সকালে গুম হইয়া বসিয়া থাকে। বাড়ির মেয়েরা বলে—কালো, ব'সে রয়েছিস যে, গোয়াল কাড়বি না!'

কালো জবাব দেয়—ত্যাহের জুৎ নাই গোঃ! পারবো না।

—পারবি না তো কে গোয়াল কা'ড়বে!—

কালো নিতান্ত অসহিষ্ণুভাবে কর্ত্তাব্যক্তির মতোই জবাব দেয়—কেনে, তোমরা কি কোত্তে আছ! সোনার হাতে গোবর নাগ্‌বে বুঝি! একদিন গো'ল কাড়্‌লে মাহাত্মি্য ক্ষয় হঁয়ে যাবে নাকি!

এমনি সম্বন্ধ তার, বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। বিরক্ত হইলে-ও, যেমন বাড়ির কোনো ছেলেকে তাড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা জাগে না,—তদ্রূপ-ই কালোকে ছাড়ানোর কথা-ও কখনও কারো মনে উঠে না। মূলে বাড়ির মেয়েছেলেরা তাকে স্নেহ-ই করে। বাড়ির চা'র বছরের ছোট ছেলে টুবুর সে 'ড্যম্বা দাদা'। কালো জাতে ডোম; 'ডোম' হইতে-ই ভাষা-তত্ত্বের কসরৎ খাটাইয়া টুবু 'ডম্বো' কথাটা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। এবং তার সঙ্গে 'দাদা' কথাটা জুড়িয়া দিয়া পরম আরামে ডাকে—'ডম্বো দাদা'।

কোন কোন দিন মুড়ি ও তামাক লইয়া, টুবুকে কাঁধে করিয়া দুপুর রৌদ্রেই গোচারণ মাঠে চলে। মেয়েরা নিষেধ করে, রোদের মাঝে তাহাকে লইয়া যাইতে,—কিন্তু, কে কার কথা শোনে! টুবুও ডম্বোদাদার কাছ ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে চায় না।

গরু কয়টি বে-পরোয়া ছাড়িয়া দিয়া পরম নির্ব্বিকারচিত্তে সে বটের ছায়ায় বসিয়া মুড়ির পোটলা খোলে। নিজেও খায়, টুবুকেও খাওয়ায়। তারপর বাগাইয়া এক ক'ল্‌কে তামাক খাইয়া লইয়া বাঁশের বাঁশীতে মেঠো গানের সুর তুলিয়া, তাহার ক্ষুদ্র শ্রোতাটিকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। কখনো নদীর ধারে গিয়া টুবুকে বনফুল তুলিয়া দেয়,—বৈঁচি আনিয়া দেয়, গাছের কোটর হইতে পাখীর বাচ্ছা পাড়িয়া দেয়; আবার কখনো খালে হাতড়াইয়া দুটো মাছ,—একটা কাঁকড়াও বা ধরিয়া দেয়।

বটের ছায়ায় আরামে শুইয়া সে বাঁশী বাজাইতেছে,—কখন কখন গরু নিয়া ফসলের ক্ষেতে নামিয়াছে, তাহার সে হুঁস্ নাই! মালিক গ্রাম হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে তর্জ্জন করে,—অকথ্য ভাষায় গালাগালি ছুঁড়িয়া মারে। কালোও আপনমনে দু'চারটা গালাগালি দিয়া লইয়া 'বেটার গরু'র উপর লাগে। ঠেঙাইয়া গরুগুলোর পিঠে পেটে দাগ তুলিয়া ছাড়ে।

বৈকালে গরু কয়টি আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া দিয়া, একটি গামলায় পাকা আধটি সের চালের অন্ন সেবা করিয়া, ডাঙ্গায় হাডু-ডুডু খেলিতে যায়। গ্রামেই বাড়ি হইলেও সে বাড়িতে শুইতে না গিয়া মনিব-বাড়িতেই থাকে। একপ্রস্থ বিছানা সে টুবুর মা যমুনা দেবীর কাছে আদায় করিয়া লইয়াছে।

. . .

সরকার-বাড়ির সঙ্গে ভট্টচায্যি বাড়ির সাত পুরুষের বিবাদ। এ বিবাদ সম্বন্ধে যখন গ্রামের লোকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, তখন সকলেই এ কথাটা স্বীকার করে যে, ভট্টচায্যিদের ঝগড়া করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, জোর করিয়া সরকারেরা ঝগড়ায় নামাইয়া ছাড়িবে। সরকারদের অবস্থা বেশ টনট'নে। ভটচায্যিরা একটু নাতোয়ান পড়িয়াছে। তবু সত্যিকার খাতির ভটচায্যিদের-ই করে লোকে। বিবাদ-বিসম্বাদে বরাবরই আক্রমণটা আসে সরকার তরফ হইতে ; আর, আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইতেই হয় আগাইয়া ভটচায্যিদের।

সে বৎসর কালোর মা ভটচায্যিদের বলিল—কালোকে আর অতো কম মাইনেতে রাখ্‌লে আমার চলবে না। অন্যত্তরে রাখ্‌লে অনেক বেশী মাইনে হবে ওর।

বেশী মাইনে দেওয়া ভটচায্যিদের সাধ্যাতীত। সুতরাং ছাড়াইবার

ইচ্ছা না থাকিলেও কালোকে জবাব দিতে হইল। ভিতরে ভিতরে সরকারেরা কালোর মাকে ভোগা দিয়াছে। অগ্রিম দশ আড়ি ধান দিয়াছে; এবং বর্ত্তমান বেতনের দ্বিগুণেরও বেশি একটা বেতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

কালোর মা সরকার বাড়ি হইতে ধান আনিয়া কয়দিন বেশ হাট বাজার করিয়া স্বচ্ছন্দে খাওয়া-দাওয়া করিয়াছে; দাঁতে একটু রস বসিয়াছে। এবং তার ফলে সরকারদের বাড়ি কালোকে রাখার তার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

জবাব দিবার দিন যমুনা দেবী ম্লান মুখে কালোকে বলিলেন—আমাদের তো অবস্থা খারাপ, কালো; তোকে বেশি মাইনে দিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমাদের নাই, বাবা! তোর মা বেশি মাইনেতে তোকে অন্যত্র রাখবে, সামর্থ্য থাক্‌লে ছাড়তাম না রে! যা আশীর্ব্বাদ করি ভালো থাকিস।

কালো কোনো জবাব না দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন হইতে কালো আর আসে না। টুবু কাঁদে—ডম্বো দাদা, ডম্বো দাদা;—ডম্বো দাদার কাছ যাবো।

বাড়ির লোকে অসহিষ্ণু হইয়া ধমক দেয়; যমুনা সিক্ত নয়নে ছেলেকে বুঝাইতে যত্ন করেন।

একদিন যায়,—দু'দিন যায়,—তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় কালো আসিয়া চুপি চুপি ভটচাযিয় বাড়ির পিছনে দাঁড়াইল। বিকাল বেলা হইতে টুবু ঝোঁক ধরিয়াছে—ডম্বো দাদার কাছে যাবো।' তাহাকে ধমক দিয়া, মারিয়া ধরিয়া কোনো ক্রমেই থামানো যাইতেছে না।

আস্তে আস্তে দরজার দিকে আগাইয়া আসিয়া কালো দেখিল—টুবু

সমানে কাঁদিতেছে। অসহিষ্ণু হইয়া যমুনা দেবী পুত্রকে দুই চড় বসাইয়া ঠেলিয়া দিলেন ; টুবু পড়িয়া গেল। কালো ছুটিয়া আসিয়া টুবুকে বুকে লইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—তোমরা খুনে—'মানষুরে' গো, ছেলেটোকে মেরে ফেলবে!" তারপর টুবুর পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাড়ির বাহিরে লইয়া গেল। বা'র-বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া দু'জনের মধ্যে সে কি রাজ্যের কথা! তা আর ফুরাইতেই চাহে না। পরদিন সকালে কালো আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে এই প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া টুবু কালোর কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। কালো টুবুকে বাড়িতে দিয়া চলিয়া গেল। যমুনা ডাকিলেন—কালো, চাট্টি মুড়ি নিয়ে যা'রে!—'না গো, আজ মুড়ি লোবো না' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিয়া কালো মাকে বলিল—দেখ্ মা, দু' সরকারদের ধান-টান ফিরে দিঁয়ে আয়গা! আমি ওদের বাড়িঁতে থাকৃতে-টাকৃতে পারবো না বাপু।

কালোর মা তো প্রমাদ গণিল। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্নাকাটি অনেক করিল; অনেক করিয়া বুঝাইল। কিন্তু, কালো কিছুতেই বাগ মানিল না। শেষে শাসাইল—দেখ্ মা, অমন যদি করিস্, আমার যি'দিকে দু' চোখ যাবে, পালিয়েঁ যাবো।

কালো মায়ের একমাত্র সন্তান। সুতরাং এত বড় শাসানির পর মা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। এদিকে 'সরকারেরা ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করিবে' ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সারারাত ভগবান্‌কে ডাকিল,—একবারও ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, কালো ভটচায্যিদের বাড়িতে আসিয়া গরু বাহির করিয়া গোয়াল কাড়িতেছে। আর, টুবু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া নাকে মুখে চোখে কথার বান ডাকাইতেছে।

তিন-তিন দিনকার সঞ্চিত যত কথা তাহার প্রাণের ভিতর 'হাকুলি-বিকুলি' করিতেছিল ; সে আজ মনের সাধ মিটাইয়া কথা কহিয়া লইতেছে।

কালো গোবর হাত ধুইয়া টুবুকে কোলে লইয়া বাড়ির মধ্যে আসিল। সম্মুখে টুবুর মা'কে দেখিতে পাইয়া চারিদিক চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল —'ওগো টুবুর মা, আমাকে বাপু দশ আড়ি ধান দাও, সরকারদের ধান শোধ ক'রে আসি। ওদের বাড়িতে আমি থাক্‌বো না।' যমুনা তাহার মুখপানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

•

কালো সরকারদের ধান ফেরৎ দিয়া আসিয়াছে। তার ফলে, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই কালোর মা'র উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গাছে শুক্‌না কাঠি ভাঙ্গা, জমিতে মাছ কাঁকড়া ধরা,—তাহার সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরকারদের কেউ নিজের সীমানার মধ্যে তাহাকে দেখিলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। গ্রামে পুকুর-গ'ড়ে, বাগান-বাগিচা সরকারদের-ই বেশি ; সুতরাং কালোর মা বড় বিপন্ন হইয়া পড়িল। গরীব মানুষ সে ; মাঠে দুটো শাক খুঁটিয়া, কি দুটো মাছ কাঁকড়া ধরিয়া না আনিলে তাহার তো চলে না! বাগানে দুটো শুক্‌নো কাঠি-মুঠি না ভাঙ্গিলে-ই বা ভাত দুটো জ্বাল দেয় কি দিয়া! সরকারদের সীমানা ছাড়া তার যে এক পা-ও চলিবার যো নাই!

মা'র এই বিপদে কালো-ও বড় মন-মরা হইয়া গেল। যমুনার প্রাণে বড় লাগিল এ ব্যাপারে। একদিন তিনি বলিলেন—কালো, তুই সরকার বাড়িতে-ই থাকগে যা' ; নইলে ব্যাপার তো সব দেখছিস!

কালো উপায়ান্তর না দেখিয়া সরকার বাড়িতে-ই লাগিল। তারপর

সমস্ত ব্যাপার চুকিয়া গেল। কেবল মাঝে-মাঝে সরকারেরা কালোকে শুনায়,—'ওদের বাড়ি কোন্ সুখে থাকৃতে গিয়েছিলিরে! ওদের তো নিজের ভাতে-ই বেগুণ-পোড়া! পরকে খেতে-প'রতে দিয়ে মাইনে দিয়ে ওরা আবার রাখ্‌বে!' কালো এ সবের কোনো জবাব দেয় না, অন্যত্র সরিয়া যায়।

তারপর কয়েক মাস চলিয়া গিয়াছে। কালো সরকার বাড়িতে-ই আছে। ফাল্গুনের প্রথম। গ্রামে আখের শাল উঠিয়াছে; আখ-মারাই চলিতেছে। সেদিন জল খাইতে আসিতে কালোর অনেকটা দেরি হইয়াছে। কর্ত্তা-সরকার বাড়ি হইতে শুনিলেন কালো বাহিরে বলিতেছে—গরু তো আমাদেব 'দ'ধে' আর 'ঘোঁচা'! এক জোড়নে তিন-তিন পাৎনা রস দিলে গো।

বাড়ির মধ্যে কালো ঢুকিল,—এক হাতে দু' গাছা আখ, আর এক হাতে এক ঘটি রস।

কর্ত্তা-সরকার বলিলেন—কিরে গরু-গরু ক'রে কি বল্‌ছিলি?

কালো আহ্লাদে আটখানা হইয়া গিয়াছিল। বলিল—বাপু, গরু আমাদের 'দ'ধে' আর 'ঘোঁচা'।

কর্ত্তা-সরকার বলিলেন—দ'ধে, ঘোঁচা কি। কা'দের?

—ও যি গো, আমাদের দ'ধে, ঘোঁচা!

কর্ত্তা-সরকার বুঝিলেন, ভটচায্যিদের গরুর কথা বলিতেছে। ধমক দিয়া উঠিলেন—তোর বাবার দ'ধে ঘোঁচা, হারামজাদা।

কালো অবস্থা বুঝিল। ধমক খাইয়া পলাইয়া গেল বাড়ির বাহিরে। সে আহ্লাদের আতিশয্যে ভুলিয়া-ই গিয়াছিল, কার কাছে কি কথা বলিতেছে।

কর্ত্তা-সরকারকে সে চিনিত; সেদিন ভয়ে আর বাড়ি ঢুকিল না। মুড়ি না খাইয়া-ই গরু কয়টি খুলিয়া লইয়া গেল চরাইতে।

আর একদিন কালো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। সকালে সে গরু বাহির করিতে আসিল না। সেদিন ভটচায্যিদের আখ কাটা হইতেছে। কালো ভোর বেলা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে ভটচায্যিদের আখ ঝুরিতে। আখ কাটে আর মাঝে মাঝে বড় দেখিলেই মাপে—এক—দুই—তিন— ওরে বাপ্‌রে! সা—ত হা—ত লম্বা!—যে যত ব'ল্‌বে বলুক আমাদের এই 'বাকুড়ি'র মতন জমি আর কোনো সাঙাতের নাই।

ছেলেপুলে মাঠে আখ চাহিতে আসিয়াছে; সে কাহাকে-ও দু'পাব ভাঙ্গিয়া দেয় কাহাকে-ও ধমক দেয়, আবার কাহাকেও বা খানিক দিয়া চোখ পাকাইয়া বলে—পালা বল্‌ছি, আর আসবি তো আখের বাড়িতে সোজা ক'রে দেবো।

বেলা প্রায় দশটার কাছাকাছি। কালো চোরের মতন ভয়ে ভয়ে সরকারদের বাড়ি ঢুকিল। কর্ত্তা-সরকার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন কালো ভটচায্যিদের আখ ঝুড়িতে গিয়াছে; সুতরাং তাতিয়া-ই ছিলেন। ঝাঁঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ গরু বা'র ক'রতে আসিস নাই কেন রে!

কালো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্ত্তা-সরকার অসহিষ্ণু হইয়া আরো চেঁচাইয়া উঠিলেন—বল্‌ হারামজাদা, কেন আসিস নাই!

ক্ষিদের সময়; কালোর-ও মেজাজটা চড়িয়া উঠিল। সে-ও একটু গলা চড়াইয়া জবাব দিল—মনিবদের আখ ঝুরতে গেইছেলাম গো।

—তবে রে হারামজাদা, ছোটলোক, 'অন্ত্যজ'—মনিবদের আখ ঝুরতে গিয়েছিলে। বাগালি কর'বেন আমার বাড়ি; কাঁড়ি-কাঁড়ি

চালের ভাত মুড়ি মারবেন ; খোরাক পোষাক মাইনে দেবো আমি ; আর বেটার মনিব হ'লো আর একজন !

কর্ত্তা-সরকার ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া পায়ের খড়ম ছুড়িলেন কালোর পানে। কালো ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেদিন সে আর সরকারদের বাড়িতেই আসিল না। গরু চালাতেই বাঁধা রহিল, মাঠে আর গেল না। পরদিন বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাহার মা আবার পাঠাইয়া দিল। কর্ত্তা-সরকারও নরম হইয়াছেন। দু'একটা মিষ্টি কথাও বলিয়া ফেলিলেন।

আরো কয়েক মাস কাটিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি। কর্ত্তা সরকারদের বাড়ির ভিতর প্রাচীরের কাছে একটি মিষ্টি জামের গাছে জাম পাকিয়াছে। গাছটির কয়েকটি ডাল পথের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। জামের লোভে গ্রামের ছেলে মেয়েরা সেখানে ভিড করিয়াছে। তবে জামের চেয়ে সরকারদের দাঁত খিঁচুনি ও গালাগালিই তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে বেশি। তাড়া খাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা কখনো ত্রস্ত দৃষ্টিতে সরকার বাড়ির ভিতর পানে কখনো বা সতৃষ্ণ ম্লান নয়নে গাছের দিকে তাকাইতেছে। শুকনা একটা পাতা গাছ হইতে খসিয়া পড়িলেও কি আগ্রহে তাহারা ঠেলাঠেলি করিয়া ছুটিতেছে ! একটা আঁকসি-বাঁধা লম্বা কঞ্চি তাহারা পাশেই মোড়লদের চালায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। সরকারেরা একটু আনমনা হইয়া বাড়ির কাজে মন দিলেই টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া দু'চারটি পাড়িয়া লইতেছে।

সঙ্গী ছেলেদের উৎসাহে টুবুও আজ আসিয়া জুটিয়াছে। সে কখনো এদিক মাড়ায় না। মুখচোরা ছেলে ; তার উপর বাড়ির লোকের

কড়া নিষেধাজ্ঞা, যেন ওধার দিয়া সে না যায়। ছেলে মানুষ; সাথীদের সঙ্গসুখে আমোদে মাতিয়া নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছে।

কর্ত্তা-সরকারের নাতি নণ্টু চাকৃলা-বিখ্যাত ডান-পিটে ছেলে। সবে বৎসর দশেক তাহার বয়স; কিন্তু এরি মধ্যে সে বেশ নাম ডাক ছুটাইয়াছে। এতক্ষণ সে তাহার পিসি-মা'র সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছিল। আসিয়াই বাড়ির বাহিরে জামের খবরদারি করিতে ছুটিল।

মোড়লদের একটি ছেলে তখন আঁক্‌সি দিয়া একটি পাকাজাম পাড়িয়াছে, টুবুকে দিবার জন্য। টুবু আসিয়া অবধি একটিও জাম পায় নাই। টুবু জামটি কুড়াইয়া লইতেছে; নণ্টুবাবু আসিয়া তাহার কোমরে এক লাথি মারিল। টুবু 'মাগো' বলিয়া পড়িয়া গেল। পাশে গরুর চালায় কালো খড় কাটিতেছিল। পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া সে নণ্টুকে দারুণ প্রহার দিল; নণ্টু পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। কালো টুবুকে কোলে লইয়া ধূলা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে চালায় লইয়া গেল।

নণ্টুর চীৎকার শুনিয়া পিসি-মা ছুটিয়া আসিলেন। ভাইপো'র কাছে, এবং আরও দু'একটি ছেলের কাছে কালোর কাণ্ড শুনিয়া রাগে উচ্চকণ্ঠে গালি গালাজ করিতে করিতে তিনি চালার দিকে চলিলেন। কালো ঝাঁঝিয়া জবাব দিল—'ওগো গালাগালি ক'রো না, বল্‌ছি; যে 'পুষ্করা' ছেলে তোমাদের! নিজের ছেলে সামলাইতে হয় এগিঁয়ে!

পিসি-মা তখন গলা সপ্তমে চড়াইয়াছেন; শুনিয়া কর্ত্তা-সরকার 'কিরে, হলো কি, হলো কি' বলিতে বলিতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া অকুস্থলে আসিয়া পড়িলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া লাঠি দিয়া কালোকে প্রহার করিতে লাগিলেন। টুবু পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, সে ভয়ে আরো চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই অবকাশে 'পায়াজোর' পাইয়া নণ্টু-ও লাগিল টুবুকে মারিতে।

কালো আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না। নণ্টুকে এক লাথি মারিয়া খড়-কাটা 'বঁটি'খানা তুলিয়া 'এইবার এসো' বলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে কর্ত্তা-সরকার সরিয়া দাঁড়াইলেন। পিছাইতে গিয়া একটা বটের শুক্‌না ডালে পা বাধিয়া যাওয়ায় নণ্টুর পিসি-মা গেলেন পড়িয়া। পড়িয়া-পড়িয়াই তিনি গালি গালাজ,—শাপ শাপান্ত করিতে লাগিলেন অজস্র। কালো টুবুকে কোলে লইয়া এই অবকাশে ভট্‌চাযিদের বাড়ি পলাইয়া গেল।

টুবু কোলে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। কালোর চোখ দুটো করমজার মতো লাল। তাহার ধূলিলিপ্ত গণ্ডে অশ্রুর দাগ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যমুনা সামনেই দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতেই কালো কাঁদিয়া উঠিয়া টুবুকে নামাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে আত্ম সংবরণ করিয়া সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, এবং কাতরকণ্ঠে জানাইল যে তাহাকে আশ্রয় দিতে হইবে। যমুনা দৃঢ় স্বরে বলিলেন—তুই এখনি হ'তে আমাদের বাড়িতে থাক; সর্ব্বস্ব দিয়েও তোকে রাখ্‌বো।

আনন্দে কালো আঘাতের বেদনাও ভুলিয়া গেল।

অবস্থার চাপে সরকারদের বাড়িতে 'বাথালি' করিতে ঢুকিলেও কালোর মন ভটচায্যিদের বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। স্নেহ সে এখানে আদায় করিয়াছিল প্রচুর এবং ছড়াইয়া ছিলও অজস্র। এক দিনের কথা; কালো তখন সরকারদের বাড়িতে কাজ করিতেছে। টুবুর খুব অসুখ হইয়াছে। ভট্‌চায্যি বাড়ি ছাড়ার পর, কেমন তাহার লজ্জা হইত, এ দিকে আসিতে, কিন্তু টুবুর অসুখ শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। সকালবেলা আসিয়া সদর দরজার বাহিরে এককোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; লজ্জায় বাড়ি ঢুকিতে পারিল না। কতক্ষণ পরে যমুনা কি কাজে বাহিরে আসিয়া কালোকে দেখিয়া

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কালো! কি মনে ক'রে! কালো মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে-খুঁড়িতে 'হা গো টুবু কেমন আছে!' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। যমুনার চোখ সজল হইয়া উঠিল; চোখ মুছিয়া বলিলেন—এখন তো জ্বর অনেকটা; ভগবান্ যা' করেন।

ভটচায্যি-পাড়ার যা'কেই সে যখন দেখিতে পাইত, তখনি জিজ্ঞসা করিত—হা গো, আমাদের টুবু কেমন আছে জানো!

একদিন বৈকালে টুবুর জ্বরটা একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। লোকে ভট্টচায্যিদের উঠান ভরিয়া গিয়াছে। কালো বাহিরে দরজার পাশে এককোণে চোরের মতো দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চেষ্টা করিতেছে,—লোকের মাথা পার করিয়া তাহার দৃষ্টিকে রোগ শয্যায় শায়িত টুবুর ম্লান মুখখানির কাছ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেওয়া যায় কিনা। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; তত্ত্ব-তল্লাসকারীদের ভিড় কমিল। কালো সেই বৈকাল হইতে প্রতীক্ষার পর এতক্ষণে ফাঁক পাইয়া আস্তে আস্তে বারান্দার নীচে অন্ধকারে আসিয়া বসিল। ঠিক সেই সময়ে জ্বরের ঘোরে টুবু বলিয়া উঠিল—'ডখো দাদা!'

—টুবু,-ভাইটি!

অন্ধকারে কালোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া যমুনা বলিলেন—কেরে, কালো! কালো ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর করিল—হ্যাঁ গো, আমি-ই! হা গো, টুবুর মা, টুবু কেমন আছে এখন!

তাহার কণ্ঠস্বরে রুদ্ধ রোদনের গুমোট বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছিল। যমুনা কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—এই দেখ্ বাবা, জ্বর কতো রে!

সেদিন রাত দশটায় কালো বাড়ি যায়। টুবুর ভালো হইলে সে পাঁচ পয়সার বাতাসা আনাইয়া হরিরলুট দেওয়ায়।

এমনি করিয়া কালো নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল ভটচায্যি বাড়ির সঙ্গে। ভটচায্যিরাও তাহাকে স্নেহ করিত খুব। তাই কালোর এই বিপদকে যমুনা নিজের বিপদ মনে করিয়াই ঘাড়ে করিয়া লইলেন। কালো-ও স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

তারপর হইতে ভট্চাযিদের সঙ্গে সরকারদের বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠিল। গ্রামে একটা দারুণ অশান্তি। গ্রামের মধ্যে দু'ঘর মানসন্ত্রমশালী ভদ্রলোক; তাহাদের মধ্যে যদি এরূপ বিরোধ বাধে, তবে গ্রামের লোকেরও শান্তি অসম্ভব। কেহ কেহ স্পষ্ট-ই একটা পক্ষ অবলম্বন করে। কেহ বা দু'কূল বজায় রাখিবার ইচ্ছায় প্রথমটা দু' নৌকায় পা দিয়া থাকে; এবং তাহারাই অনেক সময় বিবাদকে বড় করিয়া তোলে।

একদিন ভট্চাযি মহাশয় সরকারদের বাড়ির কাছ দিয়া যাইতেছেন। খবর পাইয়া বাড়ির ভিতর হইতে কে-যেন তাঁহাকে শুনাইয়া চেঁচাইয়া বলিল—ঐ বেটা কালো-ডোমকে 'ক্যাড়্-ক্যাড়্' ক'রে বেঁধে নিয়ে আস্‌বো, তবে কথা। দেখি, তাব কোন্ বাবা আছে, রক্ষা করে! আর কতো টাকা-ই বা আছে তা'র মুনিবের, দেখে নেবো!'

ভট্চাযি মশায়-ও শুনাইয়া বলিলেন—কে আছিস্ রে, বলে দে তো; যতদিন ভট্চাযি বাড়ির একটি ছেলের গায়ে-ও এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌বে, ততদিন কালোকে তারা রক্ষা ক'রবে।

তারপর দিনকয়েক খুব গরম হইয়া উঠে গ্রামের হাওয়া। দু' ঘরে হয় ফৌজদারী, নয় দেওয়ানী,—এক আধটা লাগিয়া-ই আছে।

এমনি করিয়াই দু'এক বৎসর কাটিয়া যায়। কালোর এখন জ্ঞান বাড়িয়াছে; সে ভাবিতে শিখিয়াছে। এই বিরোধের ইতিহাসে সে যে একটা নিদারুণ অধ্যায় যোগ করিয়া দিয়াছে, তা' এখন সে ব্যথিত

অন্তরেই অনুভব করে। সে এখন আর পূর্ব্বের মত বায়না-আবদার করিয়া চাপল্য বিস্তার করে না, কেমন যেন ম্লান,—উন্মনা হইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি দণ্ড চার হইয়াছে। সরকার বাড়ির উঠানে গোলার পাশে দাঁড়াইয়া কালো শঙ্কাকম্প্র কণ্ঠে ডাকিল—কর্ত্তাবাবু!

—কে রে!

—আমি-ই গো, ডোমেদের কালো।

—কালো! কি মনে ক'রে বল্ দেখি!

কর্ত্তা-সরকায় বিস্মিত হইলেন।

কালো তখন আগাইয়া আসিয়া কাপড়ের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি বেগুন কপি ও মটর শুঁটি বারান্দায় ঢালিয়া দিয়া বলিল—এই ক'টা লাও গো!

কর্ত্তা-সরকার বলিলেন—কোথায় পেলি এসব!

কালো এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—মনিবরা দিলে গো।

তারপর আর দাঁড়াইল না। মুড়ি লইবার জন্য কর্ত্তাঠাকুর ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন। বাড়ির বাহির হইতে কালো শুধু বলিল—'না গো।'

পরদিন সকালে গাছের দুটি ডালিম, চারটি কাগজি লেবু ও গুটি কয়েক পেয়ারা খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া কর্ত্তা-সরকার লাঠি ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে ভট্চায্যি বাড়ির সদর দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—ওহে ভট্চায্যি ভায়া! তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই দু' একটা গলা-খাঁকারি দিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ভট্চায্যি মশায় বিস্মিত ও ততোধিক ব্যতিব্যস্ত হইয়া 'আসুন, আসুন, সৌভাগ্য আমার, সুপ্রভাত' বলিতে বলিতে আগাইয়া চলিলেন প্রত্যুদ্গমন করিতে।

—বউমা কেমন আছেন, বল তো ভায়া !

যমুনার অসুখ করিয়াছিল।

ভট্‌চাযিৗ মশায় বলিলেন—বউমা, আজ একটু ভালোই আছেন, আপনার আশীর্ব্বাদে। আপনি চরণধূলো দিয়েছেন,—অসুখ কি আর থাকে !

'—ভগবান্ ভালো রাখুন ভাই ! এই কয়টা বউমাকে দাও।' বলিয়া কর্ত্তা-সরকার খুঁট খুলিয়া ফল কয়টি তাঁহার ভট্‌চাযিৗ ভায়ার হাতে তুলিয়া দিলেন।

'—আসুন, আসুন, বউমাকে পায়ের ধূলো দিন' বলিয়া ভটচাযিৗ মশায় তাঁহার হাতে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। যাইতেই হাত বাড়াইয়া যমুনা কর্ত্তা সরকারের পায়ের ধূলো লইলেন।

—মা, মা, কর কি, কর কি,—ওই হয়েছে মা, থাক্ থাক্ !—কর্ত্তা সরকার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া নাড়ী টিপিয়া আশ্বাস দিলেন—সামান্য জ্বর, আজ-ই ছেড়ে যাবে।

বাহিরে আসিতে-ই কালো তামাক তৈরী করিয়া আনিয়া বাম হাতের আঙ্গুল কয়টির অগ্রভাগ ডান হাতের কনুইএ ঠেকাইয়া ডান হাত বাড়াইয়া ক'লকে-টি কর্ত্তা সরকারের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—তামুক ইচ্ছে করুন, কর্ত্তাবাবু।

—কে রে, কালো যে, বেশ, বেশ !—হাঁ হে ভটচাযিৗ ভায়া, বলি, অতো সব তরিতরকারি,—বেগুন কপি মটরশুঁটি,—একটা ভোজের তরকারি হে,—অতো সব কেনে পাঠাতে গেলে বলো দেখি ভাই !

ভটচাযিৗ মশায় অবাক্ হইয়া কর্ত্তা-সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। কর্ত্তা-সরকার-ও কথার জবাব না পাইয়া, উপরন্তু ভটচাষ্যি মশায়ের বিস্মিত ভাব দেখিয়া ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন।

কালোর মুখে অপরাধীর দৈন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া পায়ের নখে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

কাহার-ও মুখে কথা নাই ; যেন একটা রহস্যভরা নীরবতা।

—কিরে, তুই কি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলি? কেউ বলে নাই তোকে দিতে?

কর্ত্তা-সরকারের কণ্ঠস্বর শক্ত হইয়া উঠিল।

কালো কথা বলে না।

কর্ত্তা-সরকার অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—কিরে কথা ক'স্‌না যে! কথা কয়টা অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ হইতে বহির্গত হইল।

কম্পিত কণ্ঠে কালো বলিল—আমি নিজেই নিয়ে গেইছিলাম বাবু। আপনাদের ঝগড়া বিবাদ বেড়েই চলেছে দেখে আমার মন হলো,—বুঝি এম্‌নি করলেই সব মিটে যাবে।'

যমুনা ঘরের ভিতর হইতে সব শুনিতেছিলেন। কর্ত্তা-সরকার এবং শ্বশুর, দু'জনেরই অভিমান ক্ষুব্ধ মনের ভাব তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং আরও বুঝিলেন—যে কালো ঠিকই বুঝিয়াছে, এবং এবং উপযুক্ত পন্থা-ই অবলম্বন করিয়াছে।

রোগশীর্ণ দেহে ধীরে ধীরে বাহিরে উঠিয়া আসিয়া কর্ত্তা-সরকারের উদ্দেশ্যে বলিলেন—বাবু-শ্বশুর, কালো যা' ক'রেছে, তা' আমাদের একান্ত অভিপ্রেত ব'লেই ধ'রে নিন। অতি সামান্য কারণের বিবাদ এমনি সহজ ভাবেই মিটে যায়! অভিমানে আমাদের চোখ অন্ধ হ'য়ে ছিল; কালো আজ সে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কর্ত্তা-সরকার বলিলেন,

—বউ মা, তুমি শুধু তোমার মনের কথাই বলো নাই মা, আমার-ও প্রাণের কথাটি বলে দিয়েছো। বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি মা, এই অভিমানের তাঁবেদারি ক'রতে ক'রতে। কালো ডোমের ছেলে হ'লে-ও, নিরক্ষর 'রাখাল-বাগাল' হ'লে-ও দু'টি বংশকে ধ্বংসের মুখ থেকে আজ টেনে তুল্‌লো। যাও মা, শোও গে, অসুখ শরীর। তোমাকে তো সবাই জানে মা লক্ষ্মী! আমি এতদিন শুধু এই কথা টাই ভাবছিলাম, তুমি থাকৃতে এ ঝগড়া মিট্‌ছে না কেন?

ভট্‌চায্যি মশায় কর্ত্তা সরকারের দুটি হাত ধরিয়া সাশ্রু নেত্রে বলিলেন—দাদা, আমি ছোট ভাই' ক্ষমা চাইবার অধিকার তো আমার আছে!

—ভাই, ভাই, ক্ষমা চাইবো তো আমি। যা' ক'রেছি, আমি-ই তো আগে ক'রেছি, ভাই!

কর্ত্তা-সরকারের কণ্ঠে আন্তরিকতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কালো একটু সরিয়া আসিয়া উঠান হইতে বারান্দায় মাথা ঠেকাইয়া একটা প্রণাম করিল; তারপর টুবুকে কোলে লইয়া বাহির হইয়া গেল। আনন্দ আর ধরে না। এক মুহূর্ত্তে তাহার মনের সকল আড়ষ্টতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরামে এক ক'ল্‌কে তামাক উড়াইয়া, তাহার অনেক দিনের অব্যবহৃত বাঁশীটি চালের বাতা হইতে পাড়িয়া ধুলা মুছিল, তারপর টুবুকে কাঁধে লইয়া বাঁশীতে ফুঁক দিতে দিতে চলিল আখের ক্ষেতের দিকে।

মমতা

'দেখো মামীঠাকরুণ, পটলার অবস্থা দেখো ; কেমন ক'রে মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, দেখো, দেখো !'—'

বলিয়া হাড়ীদের ধুলো হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

'আ মরিরে, আ মরি, আ মরি—'

বলিতে বলিতে ঘড়াটা ঘাটে নামাইয়া, ঘোষালদের বড় বউ মমতা পটলাকে তুলিয়া লইয়া, তার মুখের রক্ত জল দিয়া ধুইয়া দিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে তাহার হুঁস হইল যে, সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্যই সে ঘাটে কাপড় কাচিতে আসিয়াছিল। ব্যস্তভাবে পটলাকে ধুলোর কোলে দিয়া বলিল—'ধুলো, আমাদের বাড়িতে চল্—আমি একটা ডুব দিয়ে নি'।

ধুলো বলিল—'এমন অবেলায় কেন ছুঁতে গেলে মামীঠাকরুণ, আবার ডুব দিতে হবে।'

'—তা হোক্ গে, তুই যা আমাদের বাড়ি।'

স্নানান্তে মমতা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া, ধুপ ধুনা দিয়া ঠাকুর ঘরে তুলসী-তলায় প্রণাম করিয়া আসিয়া, ধুলোকে জিজ্ঞাসা করিল—'দিনে ভাত-টাত্ খেয়েছিস তো রে ধুলো !'

'—না মামীঠাকরুণ, ভাত কোথা পাবো !'

মমতা তাড়াতাড়ি চাট্টি গুড়-মুড়ি আনিয়া দু'ভাইবোনকে দিয়া বলিল—'এই কয়টা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ' মা, একটু পরেই ভাত দিচ্ছি।'

তাহারা গুড়মুড়ি খাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইতে, মমতা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া যা জানিল, তাহাতে তাহার মনটা বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। মুখে শুধু বলিল—'আহা!'

জমিদার-বাড়িতে অন্নপ্রাশন। ভারী ভোজ। 'দল-মাদল' কাজ। ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ লইয়াছে। এঁটো পাতা কুড়াইয়া জায়গা পরিষ্কার করা হইতেছে, ব্রাহ্মণের মেয়েছেলে খাওয়াইবার জন্য।

পাতা-শুদ্ধ মাথা-চোঁখা এঁটো ভাত-তরকারী বাড়ির বাহিরে গিয়া কাঙ্গাল গরীবদের বিলাইতেছেন জমিদার-কন্যা স্বয়ং। ওরি মধ্যে যাহারা একটু কদরের, তাহাদের-ই ভাগ্যে অনুগ্রহ বর্ষণ লাভ হইতেছে সমধিক। দরজার পাশে ধূলো দাঁড়াইয়াছিল তাহার বৎসর পাঁচের ভাইটি পটলাকে লইয়া। ধূলোরও বয়স বৎসর বারোর বেশি হইবে না। মা-বাপ, আত্মীয় বান্ধব, কেউ তাহাদের নাই; ঘর-বাড়ি, চাল-চুলোরও বালাই নাই। ভাইটির হাত ধরিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিখ মাগিয়া ফেরে সারাদিন। এ'র বাড়ী চাট্টি এঁটো ভাত—ও'র বাড়ী চাট্টি পান্তা—তা'র বাড়ী বা চাট্টি গরম ভাত, এমনি করিয়া দশজনের বাড়ি হইতে দশমুঠা সংগ্রহ করিয়া, আগে ভাইটিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া অবশিষ্ট যা' থাকে, তাই দিয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত করে। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া তাহাদের 'মামীঠাকুরুণে'র বাড়ির ভিতর ঢেঁকি-শালাটায় শুইয়া পড়ে। তাহাদের মামীঠাকুরুণ বড়লোক নয়; দুটি ছেলেমেয়েকে ভাত দিয়া পুষিবার মত অবস্থা তাহার নাই। থাকিলে ধূলোকে যে ভিক্ষা করিতে হইত না, একথাটা ধূলো নিজেই প্রচার করে। তবে, মাসে অনেকগুলি দিনই 'মামীঠাকুরুণ' তাহার দুখের ভাতের অংশ তাহাদের দিয়া থাকে।

জমিদার বাড়ি ভোজ; ভালমন্দটা প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইবে।

মন তাহাদের অতি মাত্রায় লালসাচঞ্চল। সাগ্রহে দরজার ভিতরে উঁকি মারিতেছে। তরকারী, মাছ, পায়েস, সন্দেশ, দই এক সঙ্গে মাখামাখি হইয়া এঁটু শালপাতার ভিতর হইতে যে গন্ধ ছড়াইতেছিল, তা'র লোভে পটলার অস্থিরতা চরমেই উঠিয়াছিল। জমিদার-কন্যা একটা পাতা একজনকে দিয়া যখন আর একটা আনিতেছেন,—তখনই সে দুহাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিতেছে—'আমাকে দাওগো, আমাকে দাও।' 'থাম্' বলিয়া তিনি যখন পাতাটা আর একজনকে দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন হতাশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সতৃষ্ণ নয়নে পটলা সেই পাতাটার পানে চাহিয়া থাকিতেছে। আর একটা দিতে আসিলে আবার সে ঐরূপ করিতেছে; আবার ধমক খাইয়া চুপ করিতেছে। শেষে একবার আগ্রহাতিশয্যে হাত বাড়াইতে গিয়া সে জমিদার কন্যার কাপড় স্পর্শ করিয়া ফেলিল। ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি লাথি মারিলেন পটলাকে। পড়িয়া গিয়া পটলার একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল; মাথায় পিঠে চোট লাগিল; ঠোঁটের কতকটা কাটিয়া গিয়া অজস্র রক্ত পড়িতে লাগিল।—"আহা, অম্নি ক'রে মারেগো" বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়া ধূলোও কয়টা কটু মন্তব্যের সঙ্গে একটা লাথি খাইল। সে উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাইটিকে কোলে করিয়া তার মামীঠাকৃরুণদের 'হুলে' পুকুরের ঘাটে গেল, রক্ত ধুইয়া দিতে; এবং সেইখানেই মামীঠাকৃরুণের সঙ্গে ধূলোর দেখা হইল।

পুরুষদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া থাকিলেও, দু'বাড়ির মেয়েদের মধ্যে তা' ছিল না। দিনে মমতা ও তাহার শাশুড়ী পান্তা খাইয়া কাটাইয়া দিয়াছে। হেঁসেলে ভাত ছিল না। তাড়াতাড়ি সে ভাত রাঁধিয়া ধূলোদের দিল। তাহারা দু'ভাইবোনে খাইয়া নিজের জায়গায়,—ঢেঁকিশালে শুইয়া পড়িল আরামে! অপমান—অভিমান—ক্ষোভ

তাহাদের নাই। অপ্রতিকার্য্য বিষয়ে ওরা নির্ব্বিকার। অনিবার্য্য নির্য্যাতন সহ্য করিতেই হইবে, এমনি একটা সহজাত সংস্কার লইয়াই যেন ওরা জন্মিয়াছে। অবজ্ঞাপ্রদত্ত উচ্ছিষ্টভোজন ওদের ভাগ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত!

অপমান গা-সওয়া মনে তরঙ্গ না তুলিলেও, পটলার দেহ কিন্তু আঘাতটাকে নির্ব্বিকারে সহ্য করিতে পারিল না। পরদিন সকালে দেখা দেখা গেল, তার মুখ ফুলিয়া হাঁড়ী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও অনেকটা। যত বেলা পড়ে, মুখ তত ফুলিয়া উঠে। ধুলো কাঁদে—'মামীঠাকরুণ কি হবে!' মমতা বুঝিল, রোগ জটিলতার দিকেই ছুটিতেছে। ডাক্তার চাই, সতর্ক শুশ্রূষা চাই, টাকা চাই। ভাবিবার সময় নাই; আরো পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত। মমতা শাশুড়ীকে লুকাইয়া গলার হার বন্ধক দিল। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইত-না বলিয়া অলঙ্কার সে পরিত না। সুতরাং হার বাঁধা দেওয়া ব্যাপারটা আপাতত গোপনই থাকিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—রীতিমত শুশ্রূষা যদি হয়, বাঁচিতেও পারে। মমতা এখনও পর্য্যন্ত আপনাকে সরাইয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। ঢেঁকিশালে গিয়া পটলার মাথা কোলে করিয়া বসিল! শাশুড়ী সন্ধ্যাবেলা কাপড় কাচিতে গিয়াছিলেন; আসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—ও'র সাঁঝবেলায় ছুঁতে গেলে কেনে আবার! যাও ডুব দিয়ে এসো গে।

মমতা ধীরে ধীরে জবাব দিল—আজ এইখানেই থাকি মা, আহা, ছোঁড়ার অসুখটা বড় বেশি হয়ে উঠেছে। তুমিই মা আজকার মত সাঁঝ-ধূপটা দাও।

শাশুড়ী ঝঙ্কার দিলেন—দেখে বাঁচি না বাপু, তোমার বাড়াবাড়ি;

ছোটলোক নিয়ে এত নাড়া-ঘাঁটা কেনে গো! তোমার স্বামী বিশখানা গাঁয়ের বামুনের মাথার মণি; বিধান পাঁতি সে চাক্‌লা জুড়ে দেয়। আর, তার ঘরে এই অনাচ্ছিষ্টি—অনাচার! আচ্ছা লোকের বেটী ঘরে তুলেছিলাম বাপু—বংশের গৌরবটুকু সব চিবিয়ে খেলে গো!

মমতা জবাব দিল না। শ্বাশুড়ী আপন মনেই গজ্‌-গজ্‌ করিতে করিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ লইয়া বাড়ির বাহিরে ঠাকুর-ঘরে দিতে গিয়া বুঝি হোঁচট-ই খাইলেন। ওরে বাপরে! আর রক্ষা আছে! 'এই বয়সে আমার কপালে এই দুর্ভোগ', 'লোকে বেটাবউ বাঞ্ছা করে কি জন্যে' ইত্যাদি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তারস্বরে; আর ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া মাথা ঠুকিলেন ঠাকুরঘরে। পাশের বাড়ির কর্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি প্রশ্ন করিয়া মমতার শ্বাশুড়ীর দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিয়া সহানুভূতি দেখাইলেন। সন্ধ্যা পার হইতে না হইতে গ্রামকে-গ্রাম রটিয়া গেল ছোটলোকের সঙ্গে মমতার 'ওলা মেলা'র কথা। বর্ষীয়সীরা 'লম্প' হাতে করিয়া মমতাদের বাড়ি আসিয়া মজলিস জাঁকাইলেন। ভারিক্কি হইয়া উপদেশ দিলেন; চিবাইয়া চিবাইয়া শ্লেষ করিলেন। কেউ বা প্রসঙ্গত নিজের বউমার দেমাক ও অনাচারের কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া মনের ঝাল খানিকটা মিটাইয়া লইলেন। শ্বাশুড়ীর আবার ভয়ও হইল। পার্শ্ববর্ত্তিনীদের জোড়হাত করিয়া বলিলেন—'ব'লে-ট'লে দিও না যেন বোন, তা'হলে আমার ভাতের বরাদ্দও উঠে যাবে।'

মমতা নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেল; কাহারও কথার কোন জবাব দিল না। তিক্ত মন্তব্যে তাহার মন যে বিষাইয়া উঠে নাই, তা' নয়। সুতরাং হাতে রোগীর শুশ্রূষা করিলেও,—আরব্ধ কার্য্যে অভিনিবেশের অভিনয় করিলেও, তাহার মনের ভিতর অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ, লজ্জা তরঙ্গভঙ্গে দাপাদাপি করিতেছিল। কিন্তু তাহার চরিত্রের মৃদু নমনীয়তা তাহাকে

নীরব রাখিল। সে অন্ধকারে চোখের জল ফেলিল; দু'একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিল।

মমতা নিষ্ঠার দেবী। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, হিন্দু নারীর প্রত্যেকটি বিহিত কর্ত্তব্য সে অক্ষরে অক্ষরে পালিয়া চলে। কিন্তু তবু যখন তাহার শ্বাশুড়ী আবিষ্কার করিয়া বসিলেন—'ভিতরে-ভিতরে সে চিরকাল মেলেচ্ছ' এবং সমাগতারা যখন তা' লইয়া ছোট-খাট 'কূট' কাটিতে লাগিলেন, তখনই মমতার বুকে বাজিল দারুণ। কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া, কথা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন বা স্বপ্রতিষ্ঠা করা চিরদিনই মমতার অভ্যাসের বাহিরে। কিছুই সে বলিল না।

ধূলোদের উপর মমতার সমবেদনার কথা শুনিয়া জমিদার-কন্যা দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিয়াছেন—'বটে!' তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁহাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই মমতার এই আয়োজন।

কি একটা ছুটিতে প্রভাত পরদিন সকালে বাড়ি আসিল। কর্ম্মব্যপদেশে তাহাকে বিদেশে থাকিতে হয়। স্বামীকে দেখিয়া, মমতা ধূলোকে রোগীর শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিল। প্রভাত ডাকিয়া বলিল—'শোন মমতা, তোমার এই হাড়ী-ডোম-মুচি নিয়ে 'ওলামেলা'র কথায় দেশে আর কান পাতা যায় না। তা'ছাড়া, তুমি বোধ হয় ভুলে যাও নাই যে, এ বংশ চিরদিন নৈষ্ঠিকতার জন্য সকলের পূজ্য, ব্রাহ্মণ্যগৌরবে সমুজ্জ্বল। সুতরাং তোমার নিষ্ঠাহীনতার প্রশ্রয় দিয়ে আমার পিতৃ-গৌরবকে, বংশের গরিমাকে তো ম্লান করতে পারি না।' প্রভাতের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক।

মমতা বজ্রাহতার মত দাঁড়াইয়া রহিল। একি! তাহার চিরদরদী স্নিগ্ধচিত্ত স্বামীর মুখে একি কথা! স্বামীর কণ্ঠস্বরের এই নিষ্ঠুর পারুষ্য

মমতাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিল। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল—'যা' বলবার, খাওয়া-দাওয়া ক'রেই ব'লো! সারারাত জেগে এসেছ, স্নান-টান ক'রে ফেলো আগে। আমি এসে রান্না চড়িয়ে দিয়ে তোমার সন্ধ্যার যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।'

শ্বাশুড়ী বলিলেন—'রক্ষে কর বউ মা, এই হাড়ী-ডোম রুগী নিয়ে মাথামাখি ক'রে, এম্‌নি একটা ডুব দিলেই শুদ্ধ হওয়া যায় না। গঙ্গায় মাথা না ডোবানো পর্য্যন্ত তো হেঁসেল ছোঁওয়া হবে না, বাপু! রান্না আমি করছি, তুমি তোমার রুগীর সেবা কর। তোমার রুগী সারলে, যা হয় ক'রো।'

গত রাত্রি হইতে আঘাত খাইয়া খাইয়া মমতার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াই ছিল। শ্বাশুড়ীর কথায় ক্ষোভ বাড়িয়াই উঠিল। কিন্তু শ্বাশুড়ীর কথার কোন জবাব না দিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া শক্তকণ্ঠে বলিল—তোমারও কি তাই মত!

প্রভাত দৃঢ়ভাবেই জবাব দিল—'এ মতের বাহিরে যাওয়ার তো কোন প্রয়োজন দেখি না।'

মমতা আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া রোগীর কাছে বসিল।

প্রভাত অভিমানভরে বৈকালে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় গ্রামময় রাষ্ট্র হইল—প্রভাত এই 'মেলেচ্ছ' বউকে আর গ্রহণ করিবে না; আবার বিবাহ করিবে। এ বউ ভাত খাইতে চায়, বাড়িতে কাজকর্ম্ম করিবে, থাকিবে খাইবে; পৃথক্ ঘর করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, পত্নীত্যাগ পাপ কিনা!

মমতার কাণে কথাটা ভাসিয়া আসিল। দুঃখে, অভিমানে তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। আর কেউ না চিনুক, তাহার স্বামী তো তাহাকে চেনে। একি ভুল বুঝিল সে! একটা দিন থাকিয়া একটা কথা

বলার অবকাশও দিল না। অনাচার তো সে কখনও করে না। হেঁসেল না হয়, না-ই ছুঁইল; কিন্তু স্বামীকে ছুঁইবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত হইল, এ দুঃখ তাহার মরিলেও যাইবে না। বিস্মিতও সে কম হইল না। তাহার দেব-স্বভাব স্নেহপ্রবণ স্বামী হঠাৎ এমন করিয়া বিষাইয়া উঠিল কি প্রকারে! সারারাত ধরিয়া মনে মনে কত কল্পিত সমস্যা সে তুলিল; সমাধানও করিল অনুরূপ। স্বভাবতই মমতা একটু ভাবপ্রবণ, তা'তে এই আঘাত। সুতরাং তাহার অভিমানক্ষুব্ধ মনের ভিতর বিচিত্র কল্পনার ছুটোপাটি চলিল সারারাত ধরিয়া।

ক্রমে মমতা শুনিতে পাইল—প্রভাত যখন বাড়ি আসে, গ্রামে ঢুকিবার পথে জমিদার-কন্যার সঙ্গে তাহার দেখা হয়। সে পুষ্পিত ও পল্লবিত আকারে আরও কতকগুলি মিথ্যা ইঙ্গিত মিশাইয়া মমতার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ধারণা প্রভাতের চিত্তে জন্মাইয়া দেয় এবং তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, নিষ্ঠায় ঘোষাল বাড়ি আজও সকলের প্রণম্য; প্রভাত নিজে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ও মমতা সম্বন্ধে দু' চারিটা চাপা মন্তব্য প্রভাতের কানে ঢুকিল। বাড়িতে ঢুকিয়া সে মমতাকে পটলার মাথা কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিল। তাই সে এমন হঠকারিতা করিয়া বসিয়াছিল।

মমতা ব্যাপার শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। ইহা যে তাহার স্বামীর প্রাণের কথা নয়, সাময়িক মোহ মাত্র, এই ভাবিয়া দুঃখ-ভার অনেকটা লাঘব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু—না,—তা' কি হয়। অসম্ভব। তবু একটা সশঙ্ক প্রশ্ন তার মনে কাঁটার ডগার মত বিঁধিতে লাগিল।

আরও কয়দিন চলিয়া যায়। পটলা ভালো হইয়াছে। কিন্তু মমতার দুঃখ ও অভিমান বাড়িয়াই চলে। একদিন অভিমানভরে স্বামীকে সে লিখিল—'যদি সে এতই অসহনীয় হইয়া থাকে, তবে তার

সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে চায় তার স্বামী!' প্রভাত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মমতার আছে, তার যা' ইচ্ছা সে করিতে পারে।'

মমতা শাশুড়ীর কাছে বলে—সে ঘরের কোনো জিনিষ স্পর্শ করিতে চায় না; তাকে পৃথক্ 'সের চালে'র ব্যবস্থা করা হউক। তিনি বলেন—প্রভাত না আসা পর্য্যন্ত তিনি কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

এমন করিয়া আরও কয়দিন কাটে। জমিদার-কন্যার প্ররোচনায় মমতার শাশুড়ী ধুলো ও পট্‌লাকে আর বাড়ি ঢুকিতে দেন না। তাহারাই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'!

মমতা এই হতভাগাদের বড় ভালবাসিত। এই হৃদয়হীনতা তাহার বুকে নিদারুণ আঘাত দিল। সেও আর বাড়ির মধ্যে না থাকিয়া বাহিরের ঘরে থাকিল; এবং হার বন্ধক দেওয়ার টাকা যা' অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়া খরচ চালাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ধুলো ও পটলাকে সে ছাড়িল না; বাহিরের ঘরের বারান্দার এক কোণে তাহাদের শোওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

শাশুড়ী রাগিয়া লাল হইলেন। জমিদার-কন্যা প্রভাতকে পত্র দিলেন। প্রভাতের অভিমান ছুটিয়া গেল; দুর্জ্জয় ক্রোধ তার স্থান অধিকার করিল। তার পরদিনই খবরের কাগজে যা' পড়িল, তাতে সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রটি নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে:—

"নৃশংস নারীনির্য্যাতন ও ধর্ম্মধ্বজীর কীর্ত্তি।"

অনাথ উৎপীড়িত হরিজন বালকের রোগে শুশ্রূষার অপরাধে মমতা দেবীকে তাঁহার ধর্ম্মধ্বজী স্বামী প্রভাত ঘোষাল ও শাশুড়ী অমানুষিক

নির্য্যাতন করিতেছে ; বাহিরের ঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছে। হে দেশের জননী ও ভগ্নীগণ! হে সহৃদয় ভ্রাতৃগণ! এই অত্যাচারিতা মহীয়সী রমণীর উদ্ধারকল্পে আপনারা অবহিত হউন। এই ব্যাপারে সাধারণের অর্থ-সাহায্য না পাইলে নির্য্যাতিতার উদ্ধার সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিপক্ষ প্রবল। অতএব বিনীত নিবেদন, আপনারা যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে সাহায্যকারীদের নাম প্রকাশ করা হইবে। ইতি

সম্পাদক, অনাথ ও নির্য্যাতিত সহায়িনী সমিতি।

······গ্রাম।

সম্মুখে যে ট্রেণ পাইল, প্রভাত তাহাতেই বাড়ি ফিরিল। গ্রাম-প্রবেশের মুখে সে দেখিল, পতাকাশোভিত এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত—'মমতা দেবীকি জয়', 'হরিজন কি জয়', 'নারীর মুক্তি চাই' 'ধর্ম্মধ্বজী নিপাত যাউক' প্রভৃতি চীৎকার শুনিয়া প্রভাত বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত দেহ ঘামিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। দাঁতে দাঁত টিপিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল পথের ধারে একটা মুড়ো বাঁশ ঝাড়ে। মাথায় দারুণ আঘাত লাগিল; রক্ত ছুটিতে লাগিল ক্ষতস্থান হইতে। পাশেই বাগানে ধুলো পট্‌লাকে লইয়া কাঠি কুড়াইতেছিল। সে তাহার 'মামা-ঠাকুরে'র এই অবস্থা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ছুটিয়া প্রভাতের কাছে আসিল; কিন্তু সে কি করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। পটলাকে বলিল—'তুই ছুটে যা' পটলা, মামীঠাকুরণকে শীগ্রি ডেকে আন্।' পট্‌লা ছুটিয়া গিয়া মমতাকে খবর দিল। মমতা তখন শিবপূজায় বসিয়া মাত্র

চন্দন ঘসিয়াছে। শুনিবা মাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে উচ্চারিত হইল—'শিবশঙ্কর!' তারপর স্খলিত পদে কোন প্রকারে দেহটা বহিয়া লইয়া মূর্চ্ছিত প্রভাতের কাছে আসিল। তাহারও চোখে তখন ব্রহ্মাণ্ড পাক খাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাতের বুকের পাশে সে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা প্রভাতের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল। ধুলো চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; পটুলাও তার কান্নায় যোগ দিল। মমতা সাব্যস্ত হইয়া বলিল—'চুপ কর'। প্রভাতের জ্ঞান ফিরিতেছিল। সে চোখ মেলিয়া সম্মুখে মমতাকে দেখিয়া আবার চোখ বুজিল। তাহার দু'রগের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; ললাটে দৃঢ় কুঞ্চন প্রকট হইল। মমতা তাহা দেখিয়াও দেখিল না। বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়িয়া, প্রভাতের রক্তাক্ত মাথা বাঁধিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আমার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি যেতে পারবে!'

প্রভাত নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—'থাক, থাক, তুমি স'রে যাও আমার কাছ থেকে। তোমাকে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করবার আগে আমার সংজ্ঞা যেন চিরতরে লুপ্ত হয়। ভগবান!"

তারপর সে উঠিয়া টলিতে টলিতে আগাইয়া চলিল বাড়ির দিকে। মমতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গতি তার এমন স্খলিত যে, দেখিলেই বুঝা যায়, প্রতি পদেই তাহাকে মূর্চ্ছার সঙ্গে লড়াই করিতে হইতেছে।

প্রভাত বাড়ি ঢুকিল। মমতা বাড়িতে যাইতে পারিল না। শিবমন্দিরে গেল পূজা সমাপ্ত করিতে। কিন্তু পূজা সে প্রথমে করিতে পারিল না; উচ্ছ্বসিত অশ্রুর অঝোর ঝরণ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে কোন প্রকারে পূজা শেষ করিল। প্রণাম করিয়া উঠিবে; এমন সময়ে বহিরের উঠানে 'মমতা দেবী কি জয়' ইত্যাদি কোলাহল শুনিয়া সে অতি মাত্রায়

বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রীরা শিবমন্দিরে কাছে উপস্থিত হইল। সংক্ষিপ্ত হইলেও, শোভন শোভাযাত্রাটী। সম্মুখে দুই ছোক্‌রা পেটে হারমোনিয়ম ঝুলাইয়াছে; মাঝখানে পতাকা হস্তে যেন কোন্‌ নারীসমুদ্ধারিণী সভার দুইজন নারীসভ্য এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক ধোপ-দোরস্ত নেতৃস্থানীয় যুবক। পশ্চাতে অনেকগুলি বাচ্ছাকাচ্চা, ছোট ছোট পতাকা ধরিয়া। গান চলিতেছে; মাঝে মাঝে 'ধর্ম্মধ্বজী নিপাত যাউক' ইত্যাদি উৎকট চীৎকার।

নেতৃস্থানীয় যুবকটি আগাইয়া আসিয়া নাটকীয় ভঙ্গিমায় হস্তাদি সঞ্চালন করিয়া আবেগকম্প্রকণ্ঠে মমতার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল— 'আসুন দেবী, আজি নির্য্যাতিতা আপনাকে সভানেত্রী ক'রে' আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই। তথাকথিত ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করে,' নারীর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করি; হরিজনের দাবী পূর্ণ করি। ধর্ম্মধ্বজীদের মুখে চুণকালি পড়ুক। জগতে সাম্যের বান ডাকাইয়া দি'!'

এই অযাচিত দরদে মমতার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—'বেরিয়ে যান এখান থেকে। লজ্জা-হীনতারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন! কুলবধূর এ অপমান করবার মত নির্লজ্জ দুঃসাহস কে জাগিয়ে দিল আপনাদের মনে? আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়, একটি কথাও নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে যান আমার সম্মুখ থেকে। অপরিচিতা কুলবধূর বাড়ি চড়াও ক'রে, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এত বড় বেহায়াপণা দেখাতে যা'রা সাহাস পায়, তাদের স্থান শিষ্ট-সমাজে নয়।'

বে-গতিক দেখিয়া, চাপা-গলায় সশ্লেষ কটু মন্তব্য করিতে করিতে শোভাযাত্রা ভাগিয়া গেল।

বাড়ির ভিতর হইতে মমতার দৃপ্ত মন্তব্য শুনিয়া প্রভাত বিস্মিত হইল।

জমিদার-কন্যা প্রভাতকে এই মর্ম্মে চিঠি দিয়াছিলেন যে, মমতা হরিজনোদ্ধারে মাতিয়াছে; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নেতৃ-যুবকদের সঙ্গে মমতার যোগাযোগ থাকাও অসম্ভব নয়, ইত্যাদি। প্রভাতের বিকৃতির কারণ এইখানেই। মমতার মমতাপ্রবণ চিত্তকে সে ভাল করিয়া জানিত। পূর্ব্বেও প্রভাত দেখিয়াছে, বৃদ্ধা মাতু ডোম্‌নী যখন রোগ-শয্যায়, তখন মমতা ওষুধ দিয়াছে, শুশ্রূষা করিয়াছে, ঝোলভাত রাঁধিয়া নিজে লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া আসিয়াছে। প্রভাত যে তখন ইহাতে গৌরব বোধ করিত! তাহার কাছে মমতার এই দরদ নিষ্ঠার পবিত্র চন্দনে মাখিয়া এক অপূর্ব্ব মহত্ত্বের দিব্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত যে!

জমিদার-দুহিতা যাহাদের প্রহার করিয়াছেন, মমতা তাহাদের-ই উপর দরদ দেখাইয়াছে; সুতরাং তাঁহার রাগ হইবারই কথা। জানি না, আর কোন উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল কিনা। যাহা হউক, তিনি প্রতিশোধ তুলিলেন এইভাবে। প্রভাত তো এ রহস্য ভেদ করিতে পারিল না, চেষ্টাও করিল না; মোহগ্রস্তই হইয়া রহিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সংস্কারক যুবসঙ্ঘ সংবাদ শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। অমন একজন মহিলাকে দলে টানিতে পারিলে, তাহাদের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। তাহাদের পরিচালক যুবকটি কোথাকার যেন সমিতির দু'জন নারীসভ্যাকে এই উদ্দেশ্যে আনাইয়াছিল। সে এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সভা ডাকিয়া, বক্তৃতা দিয়া, কাগজে লিখিয়া মমতার মন গলাইয়া অনেক কিছু করিতে চায় যে!

বৈকালে জমিদার-দুহিতা স্বয়ং আসিয়া প্রভাতের শারীরিক ব্যথার জন্য দুঃখপ্রকাশ তথা মানসিক বেদনায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় কোন প্রকারে সায়ং-সন্ধ্যা সারিয়া প্রভাত ঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিয়াছে ; ধূলো কাঁদিয়া উঠিল—মামাঠাকুর, শীগ্রি এসো, মামীঠাকরুনের কি হল।

প্রভাত তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখে—ধূলি-শয্যায় মমতা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ধূলোকে জল আনিতে বলিয়া প্রভাত মমতার পাশে বসিয়া নাড়ী ও নিশ্বাস পরীক্ষা করিল। ধূলো জল আনিল। জলের ঝাঁপটা মুখে-চোখে দিতে মমতার চেতন হইল। আজ প্রভাত ভাল করিয়া দেখিল—সে সোনার কান্তি মলিন হইয়াছে ; সেই সুকোমল দেহবল্লী কঙ্কাল-সার হইয়াছে ! মমতা প্রভাতকে পাশে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

প্রভাত বাহিরে আসিয়া ধূলোকে জিজ্ঞাসা করিল—জানিস, 'ধূলো ! হঠাৎ তোর মামীঠাকুরুণের এমন হ'ল কেন ?"

ধূলো বলিল—'হঠাৎ নয় মামাঠাকুর, সেই যেদিন হ'তে মামী-ঠাকুরুণ 'ভিন্নু' হয়েছে, সেইদিন থেকেই তো খাওয়া দাওয়া নাই। না খেয়ে-না-খেয়ে, ভেবে ভেবে আর কেঁদে-কেঁদে এমনি হয়েছে। আজ বিকেল বেলা থেকে কেবলই কাঁদছে।"

প্রভাত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

রাত্রে প্রভাত সবে শুইয়াছে, এমন সময়ে ধূলো বাহির হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—'মামীঠাকুরুণের আবার ফিট্‌ হ'য়েছে।'

প্রভাত দ্রুতপদে মমতার ঘরে আসিয়া বহু চেষ্টার পর তাহার চেতনা সম্পাদন করিল। মমতার মুখে একটু জল দিয়া, ধূলোকে কাছে বসিতে বলিয়া প্রভাত একটা বাটী হাতে বাহির হইয়া গেল। গোয়াল খুলিয়া, নিজেই একটা গাই দুইয়া, একবাটী টাট্‌কা দুধ লইয়া ফিরিল।

মমতা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। প্রভাত আসিয়া ধ্লোকে বলিল—'তুই শু'গে যা'; কোন ভয় নাই। আমি এখানে রয়েছি।' ধ্লো বাহিরে চলিয়া গেল।

দুধের বাটি নামাইয়া প্রভাত ডাকিল—'মমতা!'

আর মমতার চোখের জল বাধা মানিল না! সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল।

—'দুধটা খেয়ে নাও।'

প্রভাতেরও কণ্ঠস্বরে রুদ্ধ রোদন লুটোপুটি করিতেছিল।

মমতার দুধ খাওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না। প্রভাত জোর করিয়াই খানিকটা দুধ খাওয়াইল।

কিছুক্ষণ পরে মমতা বলিল—'আমি ভাল আছি, তুমি শোওগে।' প্রভাত নীরব। আবার কতক্ষণ পরে মমতা বলিল—'কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ! বাড়িতে শোওগে।'

প্রভাত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—'এতটা অপমান আমার না ক'রলেও পারতে মমতা! মাথাটা আমার হেঁট করে দিলে! কোথাও আমার মুখ দেখাবার যো নাই। যুব-সঙ্ঘে যোগ দিয়ে খবরের কাগজে আমার কুৎসা না রটালেও পারতে। বেশ করেছ! এখন ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—যেন এ রাত্রি আমার শেষ না হয়! রাতের অন্ধকারে লোকের সাবজ্ঞ দৃষ্টি হতে আত্মগোপন করে' বেশ আছি।'

—'আমি যুবসঙ্ঘে যোগ দিয়েছি! খবরের কাগজে তোমার কুৎসা রটিয়েছি! কি বল্‌ছ তুমি!—'

—'দাঁড়াও মমতা—'

প্রভাত বাড়ির ভিতর হইতে একখানা খবরের কাগজ আনিয়া মমতার হাতে দিয়া বলিল—'এইখানটা পড় দেখি!'

মমতা পড়িয়া অবাক্ হইল। তাহার বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—'আমি তো এর কিছুই জানি না!'

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মমতা বলিল—'যদি পারো, এ রহস্য ভেদ ক'রো। অমূলক সন্দেহের বিষ-বাষ্পে স্নেহ-প্রেমের পূত-বিগ্রহ কালো করো না। আমার একটি অনুরোধ, জমিদার-দুহিতার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র, তা' হ'লেই সব ব্যাপার তোমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে পঁ'ড়বে!' শেষের কথা কয়টা উচ্চারণ করিবার সময়ে মমতার কণ্ঠস্বরে ক্ষুব্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িতেছিল।

প্রভাত ভাবিতে লাগিল। সে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। মমতার বিরুদ্ধে বড় বড় প্রমাণ একদিকে,—আর একদিকে মমতার সহজ সরল দৃষ্টি, অকৃত্রিম দরদ-মাখানো কণ্ঠস্বর ও তাহার দেহের এই শোচনীয় পরিণতি। ধূলো বলিয়াছে—'যে দিন থেকে ভিন্ন হয়েছে, সেইদিন থেকে না-খেয়ে না-খেয়ে, ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে এমনি হয়েছে।' জমিদার কন্যার সহসা অস্বাভাবিক আগ্রহ ও আকর্ষণ তার উপর; যাচিয়া পথে মমতার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করা, তাকে চিঠি দেওয়া; —সবগুলো প্রভাতের মনের ভিতর এক সঙ্গে ভিড় জমাইল। এদিকে মমতা সকালে যে ভাবে সঘৃণ ক্রোধে সঙ্ঘের শোভাযাত্রাকে তাড়াইয়াছে, তা' বাড়ির ভিতর হইতে প্রভাত স্বকর্ণে-ই শুনিয়াছে। কিন্তু,—তবু—

অবিশ্বাসের বিষ-বাষ্পে স্নেহ বড় সহজেই ম্লান হইয়া পড়ে!

হঠাৎ একটা দারুণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ধূলো ভাইটিকে লইয়া বাহিরে জীর্ণ বারান্দার একটি কোণে শুইয়া ছিল। একটা কেউটে সাপ পটলকে দংশন করে; সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে! ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ধূলো ভাইটিকে কোলে তুলিতে যাইবে;—সাপটা তাহাকে-ও

বুকে কামড়ায়। উভয়ের আর্ত্ত চীৎকারে প্রভাত আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিয়া, বিপন্নভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—'মমতা, শীগ্রি এসো, সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

মমতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল পাথরের মত।

চিরিয়া রক্ত বাহির করা, পোড়ানো, ল্যাক্সিন ব্যবহার কিছুরই ক্রটি করিল না প্রভাত। কিন্তু বিধাতা যে হতভাগাদের কোলে টানিয়াছেন!

মমতার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে কাতর স্বরে বলিল—'বাঁচবে না!' প্রভাত ম্লান মুখে বলিল—'সম্ভাবনা তো দেখি না।'

প্রভাত চেষ্টার ক্রটি করিল না। ডাক্তার ডাকাইল। কিছুতেই কিছু না। সব শেষ হইয়া গেল। 'হা হতভাগারা' বলিয়া প্রভাত কাঁদিয়া উঠিল। মমতার অশ্রুধারার বিরাম নাই।

মমতা আপনার জনের মত সযত্নে তাহাদের সৎকার করাইয়াছে। সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি ফুলাইয়াছে। এক ফোঁটা জলও সে মুখে দেয় নাই।

রাত্রে প্রভাত মমতাকে বলিল—পারো তো আমায় ক্ষমা ক'রো মমতা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

—তা কেন বল্‌ছো। তোমার প্রকৃত রূপটি তো আমার অজ্ঞাত নয়! আমি স্থির জানতাম, এ তোমার সাময়িক রাহুগ্রাস!

—না মমতা, আমায় সান্ত্বনা দিও না; স্তোকবাক্যে আমার অপরাধ ঢাকতে যেও না। আমি মহাপাতক করেছি, মমতা!—বলিয়া প্রভাত আবেগভরে মমতার দু'হাত চাপিয়া ধরিল।

মমতা প্রভাতের পায়ে মাথা রাখিয়া অজস্র অশ্রুধারে তাহার পা ভাসাইল।

তাহাকে বুকে ধরিয়া প্রভাত বলিল—এই সঙ্গে যদি খুলোদের ফিরে পেতাম!

দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে মমতা বলিল—'হা হতভাগারা!

তার দু'চোখে দু'ঝলক তপ্ত অশ্রু বাহির হইয়া আসিল!

দুর্দ্দান্ত জমিদার

ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়,—এত বড় দুর্দ্দান্ত জমিদার পরিমল রায়।

বিস্তীর্ণ জমিদারী; বিপুল সম্পদ, অপ্রতিহত প্রভাব; দুর্দ্দমনীয় জেদ। রুক্ষ মুখখানাতে হাসি খুব কম ভাগ্যবান-ই দেখিয়াছে। দুষ্ট প্রজাকে ডাকিয়া আনিয়া রীতিমত প্রহার দেন কাছারিতে। অবাধ্য প্রজার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড়েন। কড়া-ক্রান্তি হিসাবে খাজনা আদায় করেন। ছাড় নাই;—মায়া-মমতা নাই। জমি বেচিয়া, গরু বেচিয়া, গয়না-গাঁটি বেচিয়া মায় সুদ বেবাক টাকা মিটাইয়া দিতে হয় খাতককে। কাহার-ও মুখ তাকান না। 'ছাড়ে'র নাম শুনিলে চটিয়া যান।

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন গরীব প্রজার ঘরে খাইতে থাকে না, হাত-যোড় করিয়া ঋণ ভিক্ষা করিলে এক 'তামা-রত্তি'—ও দেন না; কাঁদিয়া বুক ভাসাইলে-ও না; মাথা ফাটাইলে-ও না। বলেন—আমার মাটি কাটো,—ধান কলে খাটো,—আমার জমি নিড়াও,—মাইনে নাও। ঋণ দিয়ে তোমার কিসে শোধ নেবো হে!

কিন্তু দরিদ্র হইলে-ও সকলের পক্ষে তো আর তা' সম্ভব নয়। ওরি মধ্যে ভালো ঘরের ছেলে অথচ অবস্থাহীন যাহারা, তাহাদের পক্ষে মুস্কিল হইয়া পড়ে। তাহারা কান্নাকাটি করিলে ক্রুর হাসি হাসিয়া জমিদার বলেন—'তোমাদের ইজ্জৎ জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে' দেখ্‌ছি হে; এম্‌নি করে হাতে পায়ে ধরা, কান্নাকাটি করার চেয়েও কি খাটা-খাটিতে ইজ্জৎ বেশী নষ্ট হয়!

কর্ম্মচারী অনেক; বেতন সকলের-ই মাসে তিন হইতে দশের মধ্যে। তবে খায় সকলেই ঠাকুর বাড়িতে এক বেলা।

এই ঠাকুর বাড়িটি যেন জমিদার বাবুর বেয়ারা কাটখোট্টা মেজাজের একটা ব্যতিক্রম। খাইবার সময় আসিয়া এখান হইতে কেহ অভুক্ত ফিরিয়া গিয়াছে,—এমন একটা বড় শুনা যায় নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে নাকি দুপুরে ঘণ্টা পিটাইয়া-ই জানাইয়া দেওয়া হইত,—'প্রসাদ প্রস্তুত, অভুক্ত কেউ থাকো তো প্রসাদ পাইয়া যাও।' এখন আর ঘণ্টা পিটানো না হইলে-ও অনেকে-ই এখানে প্রসাদ পাইয়া যায়। তবে চর্ব্ব্য-চোষ্যের যে আয়োজন হয় না তাহা বুঝিতে পারা যায়, ভুক্ত অতিথিদের ভোজনান্ত সমালোচনা হইতে। ভোজনান্তে ঠাকুর বাড়িরই ভাঁড়ার হইতে মুখশুদ্ধি ও তামাক লইয়া অদূরবর্ত্তী পুকুর পাড়ে গাছের তলায় পেটের ভারে কাৎ মারিয়া তামাক টানিতে টানিতে তাহারা নিমকের উপর শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিয়া যায়।

—আরে রাম! এই লম্বা ডাল—এমন অদ্ভুত বাগান চর্চ্চরি,—আর এই জেঁদো খাট্টা, আমার বাপ-ও কখনো খায় নাই—

—ভাজাটা দেখেছো হে,—তেল ছাড়া ভাজা যে হ'তে পারে, তা' জন্মে এই দেখলাম—

—পায়েসটায় দুধ একটু দে বাপু,—ঠাকুরকে দিচ্চিস্!

—আরে ঠাকুরকে দিচ্চিস,—দিচ্চিস,—ঘরের ঠাকুর যা' মন হয় কর্ গে; বাইরের দুটো লোককে যদি দুমুঠো দিয়ে পুণ্যি লাভের ইচ্ছে থাকে,—একটু ভালো ক'রে-ই দিতে হয়।—

—আর, না পারিস,—এ 'বড়লোকি' তুলে দিলেই তো হয়।—

বেশ বড় গ্রামখানি। কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত-ও হইয়াছে গ্রামে।

সাধারণতঃ, অন্যায়ের অবসানকল্পে বর্ত্তমান শিক্ষিতব্যক্তিগণের বচন ও লেখনীর সঙ্গীন সর্ব্বদাই সমুদ্যত। দরিদ্রের, উৎপীড়িতের দুঃখ নিবারণে তাহাদের সহানুভূতি ও দরদ কথার ভিতর দিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে অজস্র। উপদেশে তাহারা পঞ্চমুখ।

এই অত্যাচারী জমিদার দমনের জন্য গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি একটা সঙ্ঘ তৈরী করিয়াছে। অতুলন চট্টো, অদ্বিতীয় দত্ত, অনুপম দীর্ঘাঙ্গী, এবং বরাভয় বোস গ্রামের শিক্ষিত রত্ন। প্রকাশ্য সভা সমিতি করিয়া স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় পরিমল রায়ের বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও.—নিজেদের সান্ধ্য মজলিশে,—ভুলো ভক্তর মুদিখানায়, ক্ষুদোক্ষজের রোকড়ের দোকানে, বিন্দাবন সিংএর কাপড়ের গদীতে বসিয়া জমিদারের কল্পিত মূর্ত্তির উপর তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া বীরদর্প প্রকাশ করিয়া থাকে।

আজ কে কে ঠাকুর বাড়ি প্রসাদ পাইল, ক'টা তরকারি হইয়াছে,—কেমন রান্না হইল—ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যের সাগ্রহ অনুসন্ধানে এবং সুতীব্র অপক্ষপাত সমালোচনায় ইহাদের উৎসাহ অপরিসীম।

রাঘবদাস ঠাকুর বাড়িতে প্রসাদ পাইয়া, ঠাকুর বাড়ির তৈলে সুচিক্কন ভুঁড়িটি নাচাইয়া ঠাকুর বাড়ির-ই তামাক টানিতে টানিতে চলিয়াছে,—বৈঠকখানা হইতে অতুলন চট্টো ডাকে,—ওহে দাসজি, শোন শোন।'

'এজ্ঞে' বলিয়া রাঘব বৈঠকখানায় সিঁড়ির পাশে তৈলচিক্কন হুঁকোটি নামাইয়া দুপুর বেলাতেই 'পাত-পেন্নাম' করিয়া দাঁড়ায়।

—জমিদার বাড়ি প্রসাদ পেলে বুঝি!

·—এজ্ঞে—

—রাজভোগ,—না কি বলো হে দাসজি!—

—এজ্ঞে মশায়, আমাদের মতন নোকের ঐ খুব—

—ছি ছি, কুকুরে-ও যা' খায়না, তা' ঠাকুরের মুখে তুলে দেয় কোন স্পর্দ্ধায়! আর এই দরিদ্র-নারায়ণ,—যারা সাক্ষাৎ দেবতা; যা'দের বুকের ভিতর ভগবান্ ষোলো আনা বাস ক'রছেন,—তা'দের এই অনাদর! দাসজি,—আমার প্রাণে দারুণ আঘাত হানে অহঙ্কারী জমিদারের অবহেলার দান! আমার চোখ ফেটে জল আসতে চায়!

উচ্ছ্বাসে অতুলন চট্টোর হাতে-ধরা গড়গড়ার নল ঠোঁটের কাছ হইতে কয়েক আঙ্গুল সরিয়া আসে।

রাঘব বাবাজি ভরসা পাইয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া লইয়া ঘাড়টি সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—'যদি বললেন বাবু, শুনুন আমাদের কি আর কিছু বলা সাজে!' আর একবার চারিদিক চাহিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিটি দোলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে—'ভূতেও খায় না, মাশায়!

অতুলন চট্টো পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ঘাড় নাচাইয়া বলে,—ঠিক,—ঠিক বলেছো। ভয় কি! স্পষ্ট কথা নাকের ওপর বলে দেবে, কারো বাপের খাতির করবে না। দাসজি, আজ দরিদ্রনারায়ণ জাগ্রত। দেশ বিদেশে দরিদ্রের উদ্দাম জাগরণ! দরিদ্র আর কাঁদে না—সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা'দের ন্যায্য প্রাপ্য গায়ের জোরে আদায় ক'রে নিচ্ছে। তাদের রক্তে যে সব বড় বড় অট্টালিকা গ'ড়ে উঠেছে, সে গুলো তা'রা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। বুঝলে দাসজি? আমিও আগুন জ্বালাচ্ছি গাঁয়ে। দরিদ্র ভাইদের একত্র ক'রে ঐ অহঙ্কারী কর-গ্রাহীর দালান বাড়ির প্রতিটা ইট ছাড়িয়ে জলে ফেলে তবে ছাড়বো।

দাসজির মনে সাহসের সঞ্চার হয়। বাস্তবিক-ই বাগাইয়া বলিতে পারিলে 'মুখের কথায় চিঁড়ে না ভিজিলে'ও মন রসানো যায়। একটু

আগে যে রাঘব 'এজ্ঞে মশায়' করিয়া হাত কচলাইতেছিল তাহারই মুখ দিয়া বাহির হয়,—হেঁ মাশায়, বড় নোক আছে, আপনার ঘরে আছে, আমার কি! না কি বলেন! এই দিন দেখবেন, ঠক-ঠক ক'রে হক-কথা মুখের ওপর ব'লে দোবো। বেশি তেমন-তেমন করে তো গান্দির দলে ঢুঁকে পড়বো। গান্দির নোককে সব বড়নোক যাতুরা ভয় করে।

চট্টো ঘাড় দুলাইয়া বলে—বাঃ! তোমার স্পিরিট আছে।

মরিরাম তাঁতী বিন্দাবনের দোকানে সুতো কিনিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় দত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে তাহার মনে খানিকটা গরম স্পিরিট ঠাসিয়া দেয়। মরিরামের মন অমনি ভিতরে ভিতরে আস্তিন গুটাইতে থাকে।

গোবরা মুচি তরকারি বেচিয়া হাট হইতে ফিরিতেছে। তাহাকে পাকড়ায় অনুপম দীর্ঘাঙ্গী। 'অত্যাচারী জমিদার, হাটের 'তোলা' আদায় ক'রে গরীবের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে; এ অত্যাচার নিবারণ ক'রতেই হবে।' বলিয়া এক ঝলক টাটকা মনুষ্যত্ব উদ্বমন করিয়া গোব্‌রার মনটাকে খাড়া করিয়া ধরে।

সদাই মণ্ডল খাজনা দিয়া ফিরিতেছে; সুতরাং তাহার মনটা ভালো নাই। তার উপর বরাভয় বোসের উদ্দীপনাময়ী বাণী। সদাই চাঙ্গা হইয়া দাঁড়ায়। মনে হয়, সে বুঝি একাই লাগিয়া যায় জমিদার দলনে!

এমনি করিয়া জনসাধারণের মনে জাগরণ জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দাবন সিংএর কাপড় ও সুতোর দোকান। দোকানে অনেকেরই ধারে কারবার চলে। অতুলন, অনুপম, অদ্বিতীয়, বরাভয়,—সবারই মোটা বাকী; অতঃপরও ধারে কাপড় চোপড় লইবার আশা রাখে।

সুতরাং বৃন্দাবন সিংএর দোকানে আসা, বসা, গাল গল্পাদি করা তাহাদের একটা নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যেই। বিন্দাবন টাকায় টাকা লাভ করিতে না পারিলেও বারো আনার কমই বা কেমন করিয়া পারে! ব্যবসার কল্যাণে বিন্দাবন দু'দশ টাকা করিয়াছে। বর্ত্তমানে পাকা বাড়ি ফাঁদিয়াছে, সুদি-কারবারও চালাইতেছে। এই বিন্দাবনও অত্যাচারী করগ্রাহী দমন সমিতির একজন সভ্য।

অতুলন চট্টোর সম্পত্তি ভালোই ছিল; জমিদারীও কিছু ছিল। এখনও ভূমি সম্পত্তি কিছু আছে। বাড়িতে কৃষাণ, মাহিনদার আছে। বর্ষায় তাহারা মনিব বাড়ি হইতে ধান ধার করে প্রচলিত সিকি সুদে বা তারও কিছু বেশি সুদ দিয়া। পৌষ মাঘ মাসে যে ধান মনিবের জমি হইতে ভাগ পায়, তাহা হইতে সসুদ ধান শোধ দিয়া যায়। না পারিলে পরবৎসর সুদের সুদ দিতে হয়। বেশি বাকী পড়িলে ইউনিয়নবোর্ডে নালিশ করিয়া অস্থাবরাদি ক্রোক দ্বারা আদায় করা হয়।

চট্টোর বাড়ির মেয়েরাও ছোট-খাটো বন্ধকী সুদি কারবার করিয়া থাকেন।

অনুপম দীর্ঘাঙ্গীরও জমিজিরাত আছে। কিন্তু, বহু চেষ্টা করিয়াও সে হাতে টাকা করিতে পারিতেছে না। টাকা খেলানোর দিকে অর্থাৎ সুদি কারবারের ভারী সাধ ছিল তাহার মনে মনে; কিন্তু কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। তাই, যখনই পরিমল বাবুর টাকা কড়ির কথা কেহ তাহার কাছে পাড়ে, সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে। বর্ত্তমানে তাহার বাণী—দারিদ্র্য, মনুষ্যত্ব, ভগবান্,—তিনটাই এক কথা। আর সে পারত পক্ষে জমিদার বাবুর প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়িখানার দিকে কিছুতেই তাকায় না,—তাহার চোখ জ্বালা করিয়া

উঠে

অদ্বিতীয় দত্ত মাঝে মাঝে চাকরী করিয়াছে। বড়লোক হইবার স্বপ্ন সে লাখ' দরুণে দেখিয়াছে দিনরাত, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। রায়েদের বাড়িতেও সে এক সময় ছিল। রায়েদের জমিদারী না কি তিন দিনেই উড়িয়া যাইবে! তার কাছে চালাকি! সে যে রায়েদের হাঁড়ি খবরও জানে! এমন চা'ল সে চালিতেছে —যে তিন দিন,—তি—ন—দি—নে—ই বাজি মাৎ। এই তেজো গর্ভ বীরবাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তর্জ্জনী আপনি হেলিয়া উঠে; উপরের দাঁতপাটিটা আসিয়া নীচের ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরে।—মুখে একটা 'হিটলারী' দৃঢ়তা শক্ত হইয়া দেখা দেয়।

বরাভয় বোসটি ন্যাংটা; সুতরাং তাহার বাটপাড়ের ভয় নাই। তাহার স্পিরিট' বস্তাবন্দি করিলে একটা বড় গুদামেও ধরিবে না। সে একটা অফুরন্ত তেজের নিত্যস্ফুরণশীল বোমার মতোই চলাফেরা করে।

জমিদার বাবু সমস্তই শুনিয়াছেন; প্রথম প্রথম তেমন গ্রাহ্য করেন নাই। তবে প্রজাদের কাছারীতে ডাকিয়া আনিয়া বে-পরোয়া মার-ধর করাটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সকলে বুঝিয়াছে, জমিদার ভিতরে ভিতরে ভয় খাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রজাদের চিত্ত ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। দু'একজন খাজনাও বন্ধ করিয়াছে। এমন সময় গ্রামে একটা স্বদেশী বক্তৃতা হইয়া গেল। মহানগরী হইতে আগত স্বদেশী বাবুটির মুখের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে বুঝিয়া লইল,—আর খাজনাও লাগিবে না, মহাজনের দেনাও শোধ দিতে হইবে না। এক কথায়, তাহারা আজ বুঝিল—গরীব হওয়াটা ভগবানের একটা বড় রকমের আশীর্ব্বাদ। জমিদার থাকিবে না,—বড় লোক থাকিবে না;—সবাই সমান হইয়া যাইবে,—এর চেয়ে আরামদায়ক কল্পনা,—সুখকর

সান্ত্বনা গরীবের আর কি থাকিতে পারে! বস্তুত, ধনীর উপর নির্ধনদের যে একটা চিরন্তন স্বাভাবিক ঈর্ষ্যা আছে, তাহা অস্বীকার করিয়া কাঙ্গাল-গরীবের উপর অযথা অর্থহীন সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লাভ নাই।

তারপর হইতে গ্রামে ছোট খাটো সভা-সমিতি, · বেঙ ছাতার মত গজাইতে লাগিল। সর্ব্বত্র-ই একটা উৎসাহ,—উত্তেজনা। লোকের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের মনে আর দৈন্য নাই। প্রত্যেকে-ই সম্পদ্‌হীন রাজা। একটা ঔদ্ধত্য,—একটা স্পর্দ্ধা প্রত্যেকের ব্যবহারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহারা কথায় কথায় চোখ রাঙায়, চোপড়া করে।

গ্রামের বৃদ্ধেরা আক্ষেপ করেন—হায় রে কলি! হাড়ি মুচির ছেলে আর মান খাতির রাখেনা,—একটা নমস্কার ও করে না। তাঁহারা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভারী হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

'আরে বেটা' বলিবার জো নাই আর। বলিলেই রুখিয়া দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া বলে,—বুঝে-সুঝে কথা বল্‌বেন মশায়, এইবার ব'ললে মান দিয়ে দোবো।'

অতুলন চট্টো উৎসাহিত হইয়া অতি ছোট ছোট ব্যাপারকেও বড় করিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে চারিদিকে রটনা কার্য্য চালাইতে লাগিল। সাময়িক পত্রে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চিঠি পত্র প্রবন্ধাদি ছাপিল; বেনামী দরখাস্ত ও নাকি কালেক্টারবাবাহুরের কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

অতুলন চট্টোর বৈঠকখানার সান্ধ্য মজলিস ·গুলজার হইয়া যায়। কৃতকর্ম্মের আত্মপ্রসাদে এবং ভবিষ্যতে করণীয় কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণের সোৎসাহ পরামর্শে সভা মসগুল।

তখন অগ্রহায়ণ পৌষ মাস; সুতরাং গ্রামের লোকের মনের অবস্থা

রাজা উজীর মারার মতোই। গ্রামবাসীরা পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজিয়া অতুলন চট্টোদের নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের প্লাবনের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

পরিমল বাবু এই উদ্দাম গতি রোধের আশু কোন উপায় না দেখিয়া বিমূঢ়ই হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে চোখ টেপা-টিপি করে,—অশোভন মন্তব্য শুনায়; আর নিস্ফল ক্রোধে গুমরিয়া মরা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

প্রভুত্ব লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পল্লীবাসের মোহ টুটিয়া গেল। ঠাকুর বাড়ির অন্নদান বন্ধ করিলেন প্রথম; তারপর দিলেন ধান কল বন্ধ করিয়া। তাঁহার বিরাট্ ধানের গোলাগুলি শূন্য হইয়া গেল;—বিক্রীত ধানের মূল্য গেল ব্যাঙ্কে। ধান জমি গ্রামের ভাগ জোতদারদের কাছ হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সাঁওতালদের বিলি বন্দোবস্ত করিলেন। কাছারী উঠিয়া নগরে গেল। অতুলন চট্টোর দল পাথরে তিন কিল মারিল। গ্রামের লোক মহা সমারোহে পাঁটা কাটিয়া গ্রাম্য দেবীর পূজা দিল।

চট্টো হইল গ্রামের ডিক্টেটার,—পাগড়ী হারা রাজা।

শ্রাবণ মাস; শ্রাবণ মাস যে আবার আসিতে পারে, কয়েক মাস আগে গ্রামের লোক তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। লোকের ঘরে যে অভাব,—সেই অভাব! দুর্দ্দান্ত জমিদারকে গ্রাম হইতে তাড়ানোর গৌরবে তো পেট ভরিতেছে না,—অভাব ঘুচিতেছে না।

অতুলন চট্টোর কাছে প্রতীকার প্রার্থনা করিলে চট্টো লম্বা আশা দেয়,—রিলিফ ফাণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। সে ভারী দুঃখিত যে সে নিজে কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছে না। তাহার যে সামান্য ধান আছে, তাতে নাকি নিজের সংসার চালানোই দায়। বেশি থাকিলে সে এখনই

সব দান করিয়া দিত। তবে, সাধারণের দুঃখে তাহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়! সে যা খায়, তা' নাকি চোখের জলে নোনা করিয়াই গিলে! হায়!

কিন্তু অমায়িক দরদ মাখানা শ্রীবাণীতেও যখন লোকের উদর পূরণ সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন তাহারা গেল বিন্দাবনের কাছে ধার চাহিতে। যাহার সোনা-রূপা কিছু ছিল সে প্রচলিত স্থদের হারের দ্বিগুণ স্থদ করারে মূল্যের দশমাংশ বা তারও কম ঋণ পাইল। যাহার সোনারূপা নাই, সে ফিরিয়া গেল। দেশে খাটুনি ও নাই। খাটায় কে! সবাই যে 'ভানারী' পর্য্যায় ভুক্ত!

ছেলে পিলে লইয়া অর্দ্ধাহার, অনাহারের পালা চলিল। এখন দীর্ঘশ্বাসে চোখের জলে দুর্দ্দান্ত জমিদারকে মনে পড়ে!"

তখন শাসন ছিল বটে, কিন্তু উপবাস রক্ষা তো হইত। এখন যে শুধু শ্রীবাণী শুনিয়াই পেট ভরাইতে হয়!

অতুলন চট্টো রিলিফে লাগিয়া গেল। দৈনিকে আবেদন নিবেদন ছাপিল, মাসিকে সারগর্ভ প্রবন্ধ ছাড়িল; অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া কাহিনী লিখিল। গ্রামবাসিগণকে ডাকিয়া সে সব পড়িয়া শুনাইল; তাহার উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার কত প্রশংসা কত বড় বড় লোক করিয়াছে, তাহা দেখাইল। গদগদ কণ্ঠে বলিল—তাহাদের জন্য সে কত করিতেছে।

সভা আহ্বান করিল। কলিকাতা হইতে বক্তা আনাইল। নিজে ভাবোচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া গলা কাঁপাইয়া বক্তৃতা ঝাড়িল।

কিন্তু কিছুতেই হতভাগাদের পোড়া পেট ভরিল না। তাহাদের পেট 'অ-ভয়' বলিতে হইবে!

গোবরা নিতাই মান্নার কলা কাঁদিটা রাত্রে কাটিয়া লইয়া দূরবর্ত্তী হাটে বিক্রয় করিয়া আসিল। খোক্‌না মুচি কালো মোড়লের গোয়াল হইতে ভেঁড়া চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া কয়েদ গেল। কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইয়া নিশি ডোম ও অবধূত হাড়ী খুনো খুনি ব্যাপার করিয়া তুলিল। নেত্যকালী ছুতরাণীর বে-পরোয়া ইতর গালা-গালিতে পাড়ায় তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিল। যে গ্রাম হইতে কোনদিন কোন মামলা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় নাই, এখন সে গ্রামের অনেকগুলি মোকদ্দমা বিচারাধীন।

হঠাৎ একদিন সকালে অতুলন চট্টো পুলিশ হইয়া ফিরিতেছে। অনুসন্ধানে, জানা গেল, গতরাত্রে তাহার গোলা হইতে বহু ধান চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই বিন্দাবন সিং এর গদীতে ডাকাতি হইয়া গেল।

সেদিন মধো বাউড়ী দীর্ঘাঙ্গীদের পুকুরে মাছ ধরিতেছিল বলিয়া অনুপম দীর্ঘাঙ্গী তাহাকে শাসন করিতে গিয়া ছিপের বাড়ি খাইয়া ঘরে ফিরিল।

অদ্বিতীয় ওরি মধ্যে একদিন চুপি চুপি নগরে গিয়া জমিদার বাবুর কাছে একটা চাকরীর দরখাস্ত করিয়া আসিল।

দুর্জ্জনদের স্পর্দ্ধা এতো বাড়িয়া গিয়াছে যে,—বলে কিনা বরাভয় বোস চোরাই মাল সামলায়!

কয়েকটা মাস এমনি করিয়া কাটিল। এবারও সুবৃষ্টি হয় নাই; অজন্মা হইয়াছে। দেশে দুর্ভিক্ষ ভালো করিয়াই দেখা দিল। লোকের অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। চুরির সংখ্যা বাড়িয়া গেল।

গ্রামের নিতাই স্বর্ণকারের ছেলে সত্যগোপাল এম, এ পাশ করিয়া দিল্লীতে মোটা বেতনে সরকারী চাকুরি করে। অনেক দিন পর ছুটি

লইয়া দেশে আসিয়াছে। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাহার পেটের ভাত চা'ল হইয়া গিয়াছে।

একে সে স্বর্ণকারের ছেলে,—তা'তে সরকারী চাক্‌রী, তারপর মোটা বেতন;—সুতরাং বরাভয় বোসাদির পক্ষে তা' অসহ্য-ই। তারপর কিনা সে চট্টো-দলের ডিক্টেটারীর সমালোচনা করে,—গ্রামের লোকের দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দা করে! স্পর্দ্ধা বটে!

সেদিন গ্রামে একটা সভা হইতেছে। এখান-ওখান হইতে দু'চার জন বাগ্-জীবী আমদানী করা হইয়াছে। গ্রামের অনেকে-ই আসিয়াছে। এই ধরণের সভাসমিতিগুলিতে গ্রামের লোকেরা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম-প্রথম তাহারা বাস্তবিক-ই আশা করিয়া আসিত, হয় তো সত্য-ই কিছু 'সুরাহা' হইবে তাহাদের জীবন সমস্যার। ক্রমে দেখিতে পাইল, ইহা শ্রীবাণীর মাকাল ছাড়া কিছু-ই নয়, কেবল দেশময় অতুলন চট্টোর জয়-জয়কার। তারপরে-ও যে তাহারা আসিত,—তা' কেবল মজা দেখিতে। দু'চার জন নূতন-নূতন বিশ্বপ্রেমিকের দর্শন মিলিবে,—তাহাদের শ্রীমুখের বাণীর কসরৎ-ও শুনা যাইবে তো!

সত্যগোপাল সরকারের চাকুরে; কাজে-ই কোন সভাসমিতিতে যোগ-ই সে দেয় না। কি জানি, কোন্ ফাঁকে ঠুন্‌কো চাক্‌রী টুকু চলিয়া যায়! আজ কিন্তু কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ-উপরোধ ঠেলিতে না পারিয়া সে সভায় আসিয়াছে।

বক্তৃতার বান ডাকিয়াছে। বক্তার পর বক্তা কথার তুব্ড়ি ছুটাইতেছে। ঘন-ঘন হাততালি,—শোনো শোনো রব,—শেম-শেম ধ্বনিতে মাঝে মাঝে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। একটা ভারি 'জমজমা' ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাম্যবাদ,—জমিদার দলন,—মহাজন নিপাত,—'জা'ত জুয়াচুরি',—বড় বড় সমস্যার 'ঝপ-ঝপ' সমাধান হইয়া চলিয়াছে, টপাটপ্—প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে।

সর্ব্বশেষে অতুলন চট্টো বক্তৃতা দিতে উঠিয়াছে। গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমিদারকে কেমন করিয়া জব্দ করিয়া সে গ্রামখানিকে আদর্শ ভূস্বর্গে পরিণত করিয়াছে, তাহার-ই একটা লম্বা ফিরিস্তি অগ্নিবর্ষী ভাষায় দিতেছে।

হঠাৎ সত্যগোপাল প্রতিবাদ করিয়া বসিল। সে সোজা বলিয়া দিল—গ্রামখানিকে অধঃপাতে দিয়াছেন আপনারা।

অতুলুন চট্টো দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—কাজটা এতো বড়,—এবং আপনার মন এতোটা সঙ্কীর্ণ, যে আপনি এটা :বুঝেই উঠ্‌তে পারবেন না।

বরাভয় বোস টিপ্পনী করিল—গজভুক্ত ন হন্যতে।

সত্যগোপাল বলিল—হয় তো তাই। তবু আপনাদের উদার মনের সাহায্যে একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা করা যা'ক। দেশের উন্নতি মানে যদি হয়, বাণীর ইন্দ্রজাল তৈরী ক'রে, কৃত্রিমদরদের মরীচিকায় ভুলিয়ে হতভাগ্য নির্ব্বোধ দরিদ্রদের সর্ব্বনাশ সাধন করা,—তা' হ'লে, দেশের উন্নতি আপনারা করেছেন প্রভূত। যদি হতভাগাদের ভাগ্যকে ভাঙ্গাইয়া নিজের সুনাম-সুখ্যাতি অর্জ্জন করাকে দেশোদ্ধার করা বলে,—তবে সে মহৎ কর্ম্মের জন্য কৃতিত্ব ষোল আনা-ই প্রাপ্য আপনাদের। বিশ্বপ্রেমিক আপনারা,—অ-থই আপনাদের প্রেম ; এই সঙ্কীর্ণ মন দিয়ে তার ধারণা ক'রতে যাওয়া হয় তো বিড়ম্বনা। তবু বুঝি না, বিশ্বপ্রেমের এমন গণ্ডা-গণ্ডা বুদ্ধ-চৈতন্য গাঁয়ে থাকতে, হতভাগারা উপোস মারে কেন ? বিশ্বপ্রেমিকের দল পোলাও পাঁঠা মেরে পান চিবায়, সিগারেট টানে,

বক্তৃতা করে, সাহিত্য করে, আর এই উপবাসশীর্ণ হতভাগারা মরবার জন্য ভগবানের কাছে দিনরাত কাতর প্রার্থনা জানায় কেন? আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন অমায়িক সাম্যমৈত্রীর অর্থভেদ ক'রতে পারছি না, হয় তো পারবো-ও না,—অথবা 'হাতী মারা'র বংশে না জন্মালে বুঝি এর মাহাত্ম্য বুঝা যায় না! যা হোক, জমিদারকে গ্রাম থেকে স'রতে বাধ্য করেছেন,—তিনি সুদসমেত খাজনা আদায় করতেন,—ঋণের টাকার সুদ ছাড়তেন না, দুর্জ্জনকে প্রহার করতেন, ব'লেই নাকি! তাই যদি হয়, চট্টো মহাশয়, আপনার কৃষাণেরা আপনাকে ধানের 'বাড়ি' দেয় কেন? আপনাদের ঘরের মেয়েরা দেড়া-সুদে বন্ধকী কারবার করেন কেন? বিন্দাবন সিং দ্বিগুণ সুদে কারবার চালাচ্ছে, টাকায় টাকা লাভে ব্যবসা করছে; তার বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদের টু-শব্দটি-ও শোনা যায় না কেন? স্বীকার করি, জমিদার অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত; কিন্তু তিনি গ্রামে থাকতে লোকে তো গণ্ডা গণ্ডা উপোস ম'রতো না! তাঁর ধানকলে, তাঁর ক্ষেতখামারে, তাঁর কাছারীতে খেটে সবাই তো পেটের ভাত ক'রে খেতো! অভুক্তদের জন্য তাঁর ঠাকুর বাড়ি খোলা ছিল। দুর্জ্জনের স্পর্দ্ধা তিনি দেখ্‌তে পারতেন না, তাঁর ভয়ে গ্রামে কারো জিনিষ কেউ ছুঁতে-ও সাহস করতো না। আজ গ্রামে অবাধে ছোট-ছোট চুরি চলেছে,—শোনা ও যাচ্ছে, কেউ কেউ নাকি সেই চোরাই মাল সামলিয়ে ভুঁড়ি-ও বাগাচ্ছে। গ্রামে অশান্তি, ঝগড়া, গালাগালি, মারামারি নালিশ-মোকদ্দমা হুহু ক'রে বেড়ে চলেছে। গ্রামকে ভূস্বর্গ করেছেন বটে! মূলে, আপনাদের ঈর্ষী মন জমিদারের সম্পৎ ও প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। আপনারা চেয়েছেন, জমিদার আপনাদের মত হোক! কেন তা' হ'তে যাবে? গ্রামের অর্দ্ধনগ্ন, নিঃসম্বল যা'রা, অর্দ্ধাহার বা অনাহারে মৃতপ্রায় হ'য়ে আছে,

তা'রা যদি বলে,—সবাই আমাদের মত হোক,—তাতে কি আপনারা রাজী হবেন! জমিজমা, ঘরবাড়ি, পোলাও-পাঁঠা ছেড়ে দিয়ে, মেয়ে-ছেলের হাত ধরে, তাদের মতন অন্নভিক্ষা কর'তে পারবেন! এক বেলা পরের দেওয়া উচ্ছিষ্ট,—উপবাস?—আপনারা চান একজনকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা নেতা হতে,—প্রভুত্ব করতে। অথচ, সে শক্তি আপনাদের নাই। বিশ্বপ্রেম, সাম্য, মৈত্রী, এ কথাগুলো আপনাদের ফাঁদ, বিজ্ঞাপন! দুর্দ্দান্ত জমিদার তবু তো খাবার যোগাড় ক'রে শাসন করতেন। আর আপনারা চালাচ্ছেন,—অমানুষিক অত্যাচার; উপবাসক্লিষ্ট হতভাগ্যদের খুন ক'র্‌ছেন! বাণীর মধু ছড়িয়ে মেরে দেওয়ার চেয়ে খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে শাসন করাকে আজ গ্রামের কাঙ্গালের দল চাচ্ছে প্রাণপনে। অনুগ্রহ ক'রে আপনাদের বিশ্বপ্রেমের জাল গুটিয়ে নিন। লোকে হাঁফ ছেড়ে বাচুক। পেটের জ্বালায় ক'জন গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে, খোঁজ রাখেন? আরো কতজন পালাই-পালাই করছে জানেন! দুদিন পরে, অনেকেরই ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন ক'রে ছাড়বেন আপনারা। গ্রামের লোক এখনো যদি বাঁচতে চায়, গ্রামে তা'দের বাস রাখতে ইচ্ছা করে, তা' হ'লে তা'দের উচিত অবিলম্বে আপনাদের মায়াজাল হ'তে মুক্ত হওয়া।

ক্রুদ্ধ প্রেসিডেণ্ট্ বজ্র গর্জ্জনে সত্যগোপালকে সভা ত্যাগের আদেশ দিলেন; সত্যগোপাল সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অতুলন চট্টো মুখটা হাঁড়ি করিয়া বলিল,—আচ্ছা।

সত্যগোপাল নাকি স্বদেশী দলে যোগ দিয়াছে! এমন একটা ভয়ঙ্কর লোককে যাতে চাকরীতে রাখা না হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্টকে সাবধান করা হইয়াছে, বেনামী চিঠিতে। একাধিক সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে,—সরকারের চাকুরে হইয়াও দেশজননীর মুখোজ্জ্বল

কারী সুসন্তান সত্যগোপাল গ্রামে জোর স্বরাজ আন্দোলন চালাইয়াছে। অক্লান্ত কর্ম্মী ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রমাণও নাকি হইয়া গিয়াছে,—যে সে উগ্রপন্থী স্বরাজী। সুতরাং চাকুরিটি খতম হইয়া গিয়াছে। সত্যগোপাল দারুভূত'!

•

বৎসর তিনের পর। দেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। অতুলন চট্টোর দল চাঁদার খাতা লইয়া বাহির হইয়াছে। খবরের কাগজে নিবেদন ছাপা হইয়াছে। সন্ধ্যার মজলিস জোর চলিতেছে। চা, মিষ্টি, সিগারেট হরদম। ভালো ভালো বাঁধানো খাতা আসিতেছে জমাখরচের জন্য; চেকবই ছাপা হইতেছে; রিলিফ অফিসের জন্য চেয়ার টেবিল, টেবিলক্লথ, আলো ইত্যাদি ইত্যাদি অফিসের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কেনা হইতেছে। কর্ম্মীদের জন্য allowance বরাদ্দ হইয়াছে। দু'একজন মজুর শ্রেণীর লোককে দু' এক পোয়া চাল দেওয়া হইতেছে। কিন্তু হায়! যার বাড়িতে ছেলে মেয়েতে পাঁচ সাতটি, একপোয়া কি আধসের চাল দেওয়া মানে তার অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর করিয়া তোলা। কারে বাদ দিয়া কে খাইবে! অবস্থাহীন ভদ্রলোকের অবস্থা অতি ভীষণ! তাহাদের বুঝি না খাইয়া সপরিবারে মরা ছাড়া গত্যন্তর নাই!

পরিমলবাবু গ্রামের দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন। রক্তচক্ষু দুর্দ্দান্ত জমিদারের-ও প্রাণের ভিতর কোমল প্রবৃত্তি থাকা টা অসম্ভব নয়; অন্ততঃ, গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার পর গ্রামের জন্য একটা মমতাবোধ তাঁহার জন্মিয়াছে, একথা বলা যায়।

তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, একদিন গ্রামে আসিলেন! দুঃস্থ গ্রামবাসীরা কাঁদিয়া পড়িল তাঁহার পায়ে। হয় তো তাঁহার-ও

অন্তর ভিতরে-ভিতরে কাঁদিয়া ফেলিল। ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন, 'গ্রামে জানিয়ে দিন, কা'ল থেকে যা'র ইচ্ছা ঠাকুর বাড়ি প্রসাদ পাবে। আপনি আজ-ই যথাযোগ্য বেতনে জন তিনেক পাচক গ্রাম থেকে ঠিক ক'রে ফেলুন। আর দু'এক দিনের মধ্যে যাতে ধানকল চালু হয়, সে ব্যবস্থা করুন। আমার সহরের বাড়ি থেকে সমস্ত ধান এখানে আনতে হবে কাল-ই। জানিয়ে দিন,—যার ইচ্ছা ধান 'বাড়ি' নিতে পারে।

পরদিন গ্রামবাসীদের বহু গোগাড়ী ভাড়া করিয়া সহর হইতে ধান আনা হইল।

ধানকল চালু হইয়াছে। কাছারি বাড়ি আবার লোকজনে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর বাড়িতে বহুলোক প্রসাদ পাইতেছে প্রতি-দিন। গ্রামে উপবাসের হাহাকার থামিয়া গিয়াছে।

* * * *

বরাভয় এক ভীষণ পুলিস কেসে পড়িয়া গিয়াছিল, চোরাই মাল সাম্‌লানোর সন্দেহে, উপায়ান্তর না দেখিয়া সে পরিমল রায়ের পায়ে জড়াইয়া ধরে ; এবং তাঁহারই চেষ্টায় এবারটা সে খুব বাঁচিয়া গিয়াছে।

সাধারণের অর্থের অপব্যহার করার জন্য অতুলন চট্টোর বিরুদ্ধে গ্রামের লোক এক মামলা জুড়িয়া দিয়াছিল। শেষে চট্টো অত্যাচারী কর গ্রাহীর কাছে বহু আনা-গোনা করিয়া কোনো প্রকারে ব্যাপারটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছে।

অদ্বিতীয় কাছারীতে চাকরীর উমেদারী করিতেছে এবং অনুপম পরিমলবাবুর কোনো মহালে একটা গোমস্তাগিরির তালে ফিরিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বিন্দাবন সিং এর দোকানে বসিয়া অতুলনাদি বন্ধু-চতুষ্টয় দুঃখ করিতেছিল—পল্লী-উন্নয়নের কত বড় একটা স্কিম তাহারা

খাড়া করিয়াছিল ; কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত দুর্জ্জনেরা সব নষ্ট ক'রে দিল ! তাহারা নিজের মঙ্গল বুঝে না। কি দৃঢ়মূল অজ্ঞতা!

সত্যগোপাল কোথা যেন যাইতেছিল। কথাটা কানে আসিতে-ই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁ চট্টো মশায়, অজ্ঞতা তা'দের পাহাড়ের মতো-ই বটে। কিন্তু নিতান্ত রক্তমাংসের জীব তা'রা। তা'রা চায় আগে বাঁচতে ; ছেলেপিলেদের মুখে দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে। তা'রা সাতগোষ্ঠি মিলে অনাহারে ম'রে আপনাদের স্কিমকে সাফল্য মণ্ডিত ক'রতে পারবে না, তা' সে স্কিম যতো-ই বড় হোক্না ! নেতা হওয়াটা এতো সোজা নয়, চট্টো মশায়। শুধু ছেঁদো কথার ইন্দ্রজাল তৈরী করা, আর আমার মতন হতভাগার অন্ন মারার শক্তি নিয়ে নেতৃত্ব করা যায় না। আপনাদের মতন লোকের দ্বারা কি দেশোদ্ধার সম্ভব হয় ? 'গজস্তত্র ন হন্যতে',—না কি বলেন বরাভয়বাবু! আর, অশিক্ষিত গ্রামের লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিন,—আপনারাও তো আপন আপন ব্যাপারেদেখলেন,—এখনও এমন দুর্দ্দান্ত জমিদারের প্রয়োজন আছে।

জয় পরাজয়

ছোট গ্রামখানি। তার অভাব অভিযোগ-ও ছোট-খাটো। দ্বন্দ্ব কলহ জয়পরাজয় সব-ই ছোট। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার তেমন কোনো সম্বন্ধ বা সম্বাদ নাই,—বিশেষ কোনো রকমের আদান প্রদানও নাই। নিতান্ত পুরাণো, সেকেলে ধরণের। চা পর্য্যন্ত ঢোকে নাই। বর্ত্তমান সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচিত কেহ-ই একথা বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, তথাপি ইহা সত্য।

প্রতিবৎসর-ই পূজার সময় সন্ধিক্ষণের বলিদান লইয়া এ গ্রামের রায় বাড়ি ও ঠাকুর বাড়ির মধ্যে একটা রেষারেষি চলে; এবং বলিদানের পর, কাহাদের বলিদান আগে হইয়াছে, ইহা লইয়া অমীমাংসিত বচসা হয়। কথা কাটাকাটি, গালাগালি, কিছুই বাকী থাকে না; আবার দু'দিন পরে গলা-গলিরও অন্ত নাই। এমনি ব্যাপার নাকি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খাওয়া-দাওয়া করণ-কারণ সবই চলিতেছে, দু'বাড়ির মধ্যে। তবু তাহাদের বলিদান সমস্যার সমাধান হয় নাই। পুরুষানুক্রমিক এ সমস্যা; ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, বুঝি এর রফা নিষ্পত্তি কখনোই হইবে না।

রায়বাড়ির বর্ত্তমান কর্ত্তা ভবানন্দের কন্যা শঙ্করীর সঙ্গে পার্ব্বতী ঠাকুরের পুত্র সুরেশ চন্দ্রর বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করী বাপের বাড়িতেই থাকে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ শ্বশুর বাড়ি মাড়ায়। একরোখা, কটুভাষিণী, তীব্র মেজাজী এই শঙ্করী। সুরেশ চন্দ্র নিজের বাড়িতে বউ লইয়া রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে; রাগারাগি করিয়াছে। শঙ্করী

গ্রাহ্য করে নাই। খুব বেশি ভয় দেখাইলে শঙ্করী খোলসা অভিমত দেয়,—'না হয় ভাত খাবো না।' এর উপর আর কথা চলে না। ঠাকুরেরা জোর করিয়া ধরিয়া লইতে আসে। শঙ্করীকে তো লইয়া যাইতে পারেই না; মাঝখান হইতে দু'ঘরের মনোমালিন্যটা একটু প্রবলতরই হইয়া যায়। শঙ্করী যে ছেলে মানুষ, তা'নয়; বয়স তাহার কুড়ির কম হইবে না। কিন্তু তাহার প্রকৃতি অনমনীয়।

সুরেশচন্দ্র কঠিন শপথ করিয়া পত্নী ত্যাগ করে; শঙ্করী ও উচ্চ কণ্ঠে ভাতে জবাব দেয়। সুতরাং দু'বাড়ির মধ্যে এখন আর মোটে সম্প্রীতি নাই। একটা না একটা ছুতো ধরিয়া দৈনন্দিন ঝগড়া-ঝাঁটি লাগিয়াই আছে। রায়েরা অবস্থাপন্ন; প্রভাব প্রতিপত্তি গ্রামে খুব। লোকও ভালো। ঠাকুরেরাও লোক ভালো, তবে অবস্থা খারাপ বলিয়া খুব বেশি মান খাতির নাই।

সে বার রায়েরা ঠাকুরদের বড় ঠকাইয়াছিল। তখনও মনোমালিন্যটা বর্ত্তমানের তীব্র আকার ধারণ করে নাই। তবে বলিয়াছি তো, বলিদান ব্যাপারে তাহাদের আত্মীয়তা নিতান্ত জলীয় আকার ধারণ করে।

গ্রামের মাইল-দেড় পশ্চিমে ফুল্লরা মহাপীঠ। এ ধারের প্রথা,—মহাপীঠের সন্ধির বলিদান হইবার পর ঘণ্টা পিটাইয়া দিলে, সে শব্দে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে বলিদান হয়। এই শব্দ শুনিবার জন্য গ্রামের বাহিরে 'ডাঙ্গাতে' কেহ কেহ অপেক্ষা করে। স্থানীয় ভাষায় এ ব্যাপারকে বলে 'বা লওয়া'। সেবার দু বাড়ির লোকেই 'বা' আনিতে গিয়াছে; রায়েরা কিন্তু, ভিতরে ভিতরে ঠিক করিয়াছিল, এবার ঘড়ি দেখিয়া বলিদান দিবে।

মহাপীঠের ব্যাপার। বলিদান করিতে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায়ই অতি

ক্রান্ত হয়। এদিকে 'বা' আসিবার পূর্ব্বেই ঘড়ি দেখিয়া যথা সময়ে বলিদান করিয়া রায়েরা দিল ঢাক বাজাইয়া! ঠাকুরেরা ঢাকের শব্দে না শুনিতে পাইল 'বা',—না পারিল রায়েদের সঙ্গে বলিদান করিতে। ভারী বেকুব হইয়া গেল।

সে বার রায়েরা এই ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গগীতি রচনা করিয়া নবমীর রাত্রে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করিল। এই অপমানে ঠাকুরেরা খুব রাগিয়া গেল।

ঝগড়া হইল; হাতাহাতি হইল। মামলা চলিল। গ্রামের সবাই প্রায় রায়েদের অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। ঠাকুরেরা হারিয়া গিয়া গ্রামে প্রায় 'একঘরে'র মতন হইয়া রহিল। বউ আনিবার জন্য ঠাকুরেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিল; পারিল,—না। সুরেশচন্দ্র পত্নী ত্যাগ করিল; শঙ্করীও স্বামী বর্জ্জন করিল। গ্রামের লোকের ব্যবহারে চটিয়া গিয়া পর বৎসর পূজায় ঠাকুরেরা চিরাচরিত লোকজন খাওয়ানো বন্ধ করিল। রায়েরা কিন্তু ভূরিভোজন করাইল নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিল। সুতরাং লোকে ঠাকুরদের চণ্ডীমণ্ডপ দিয়াই আসিল না। ঠাকুরেরা ঘরে-ঘরেই পূজা সারিল।

এই পরাজয়ের অপমান সুরেশচন্দ্রের বুকে বাজিল বজ্রের মতন। সে এই 'একঘরে' অবস্থায় গ্রামে বাস কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। বহু চেষ্টা করিয়া কোথায় যেন কি একটা চাকরী যোগাড় করিয়া গ্রাম হইতে সরিয়া পড়িল; তারপর আর দেশে আসিল না।

আবার পূজা আসিল। ঠাকুরেরাও জেদ ছাড়িল না,—গ্রামের কাহারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিল না। রায়েদের সঙ্গে ঝগড়া তো সমানেই চলিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বাড়ি আসে নাই। বাড়িতে লোকের মধ্যে বর্ত্তমানে

প্রৌঢ় বয়সেই রোগে শোকে জরাগ্রস্ত পার্ব্বতী ঠাকুর, তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয় পুত্র নরেশচন্দ্র এবং দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা অপর্ণা। এক বিধবা ভগ্নী পার্ব্বতী ঠাকুরের 'ভাত-জল' করিতেন; তিনিও গত ভাদ্রে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। এখন নরেশ ও অর্পণা, দু' ভাইবোনকেই বাড়ির সব কাজ করিতে হয়। বৃদ্ধও যথা সম্ভব কাজে যোগ দেন।

এ বাড়ির রীতি,—সপ্তমী পূজার দিন সকাল বেলা সমীপবর্ত্তী নদী হইতে নব পত্রিকা স্নান করাইয়া দোলায় করিয়া আনিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এবার মাকে কে-কে আনিবে ভাবিয়া পার্ব্বতী ঠাকুর কাতর হইলেন। সুরেশচন্দ্র আসে নাই; পুত্রবিরহকাতর বৃদ্ধ চণ্ডী মণ্ডপে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইলেন।

বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় তাড়া দিলেন, বার বেলা পড়িবে; শীঘ্র নব পত্রিকা স্নান করাইয়া আনিতে হইবে। পার্ব্বতী ঠাকুর কাঁদিয়া ফেলিলেন,—'মাকে কে আন্‌বে ভটচায্যি মশায়।' অপর্ণা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—'বাবা, নরু দাদা আর আমি আনবো।' 'মা'—বলিয়া বৃদ্ধ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গ্রামের পথ বাহিয়া পার্ব্বতী ঠাকুর চলিয়াছেন, ঘট ভৃঙ্গার ও নব-পত্রিকা স্নানের উপকরণ লইয়া। দোলা বহিয়া সম্মুখে চলিতেছে নরেশ,—পশ্চাতে অপর্ণা। ঘণ্টা কাঁসার ধূপধুনা নাই; বহিবার লোক নাই। বৃদ্ধ মুখ নামাইয়া চলিতেছেন। দৈন্যের গ্লানি সমস্ত মুখখানা ছাইয়া ফেলিয়াছে। দু'চোখে অবিশ্রান্ত ধারা। নরেশ ও অপর্ণা চলিয়াছে ম্রিয়মান; বাবার প্রাণের বেদনার ছোঁয়াচ তাহাদের কোমল চিত্তে বড় করুণ দোলা দিয়াছে।

গ্রামের সকলে এ দৃশ্য দেখিল। শঙ্করী মজা দেখিবার জন্যই হয়তো সদর দরজায় ধারে দাঁড়াইয়াছিল। মাথায় কাপড় নাই;—খেয়াল ও

নাই সেদিকে। মুখ খানা শক্ত করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে শ্বশুরদের দৈন্য দেখিল ; তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকিল।

মাকে স্নান করাইয়া বৃদ্ধ পার্ব্বতী ঠাকুর ফিরিয়া আসিতেছেন। পা টলিতেছে, মাতালের মতন। চোখের জলে বৃদ্ধের দৃষ্টি অবরুদ্ধ। তাঁহার স্খলিত কণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চরিত 'মা-মা' বাতাসের বুকেও রোদনের গুমোট বেদনা জাগাইতেছিল। বাবার করুণ রোদনে নরেশ ও অপর্ণার গণ্ড বাহিয়া জলধারা গড়াইতেছিল ; ডান হাতে দোলার বাঁশ ধরিয়া তাহারা বাম হাত দিয়া চোখ মুছিতেছিল।

শঙ্করী সে দৃশ্যও দেখিল, শুষ্কনয়নে, মুখবুজিয়া। শঙ্করীর আত্মীয়াগণ উপভোগ করিল,—সশ্লেষ মন্তব্য করিল। শঙ্করী যেন একটু আনমনা।

মহাষ্টমীর রাত্রি। সন্ধিপূজা আরম্ভ হইয়াছে। বলিদানে বিলম্ব নাই। কামার সংবাদ দিল,—তাহার বাড়িতে হঠাৎ কি যেন বিপদ ঘটিয়াছে, সে ঠাকুরদের বলিদান করিতে আসিতে পারিবেনা। লোকের চেষ্টাও সে নাকি করিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই।

পার্ব্বতী ঠাকুরের পূজা ভুল হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। কথাটা রায়েদের কানে গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভবানন্দ রায় বলিল—ঠিক হ্যায়।

রাত্রি দুপুর। চারিদিক নিস্তব্ধ, 'টু'-শব্দটিও নাই। মহাসন্ধির প্রতীক্ষায় সমগ্র বিশ্ব অবাক্ উৎকণ্ঠায় উন্মুখ। এবার ঠাকুর বাড়ি হইতে কেহ 'বা' আনিতে যায় নাই।

আর্ত্তকণ্ঠে মা-মা বলিতে বলিতে পার্ব্বতী ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত মায়ের চরণামৃত লইয়া তাঁহার মুখে চোখে দিতে লাগিলেন। নরু ও অপর্ণা কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে।

শুধু ব'সে ব'সে কাঁদতেই শিখেছিস;—খুলে নিয়ে চল পাঁঠা হাঁড়ি-কাঠের ব'সে কাছে। 'ক্ষণ' পেরিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস না। কাঁদ্‌বি পরে।—

ছুটিয়া আসিয়া এই মন্তব্য করিতে করিতে উন্মত্তার মতো শঙ্করী ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া মার পাদ মূল হইতে একমুঠি পুষ্প তুলিয়া লইল। তারপর খড়্গখানা তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, নরেশ ও অপর্ণা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'এখনো দাঁড়িয়ে আছিস চুপক'রে, খাবার যম কোথাকার! খুলে নিয়ে চল পাঁঠা। আমি বলিদান করবো, তোদের ধর্‌তে হবে।

নরেশ কাঁদিতে কাঁদিতে 'বউদি' বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পাঁঠা খুলিয়া লইয়া হাঁড়ি কাঠের কাছে গেল। এমন সময় ফুল্লরা মহাপীঠের ঘণ্টার শব্দ। নরেশ একাই পাঁঠা ধরিল। 'জয়মা' বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে শঙ্করী কোপ করিল। পাঁঠা কাটিয়া গেল। শঙ্করী খড়্গ হস্তেই 'মাগো' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! নরু ও অপর্ণা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শঙ্করী মূর্চ্ছান্তে যখন উঠিয়া বসিল, তখন ঠাকুরদের চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গন লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। শঙ্করীর বাবা মা ও আত্মীয়গণ তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া কান্নাকাটী করিতেছেন। পার্ব্বতী ঠাকুর চোরের মতো একপাশে দাঁড়াইয়া শঙ্করীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। নরু ও অপর্ণা দূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

সেই শত্রুপুরী হইতে অবিলম্বে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শঙ্করীর বাবা ভবানন্দ রায় ব্যস্ত হইয়া শঙ্করীকে বলিলেন—চলো মা, বাড়ি চলো।

শঙ্করী চারিদিক চাহিয়া শ্বশুরকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। তারপর ধীরপদে আগাইয়া চলিল শ্বশুরের দিকে।

শঙ্করীর মা বলিলেন,—ওদিকে কোথায় যাচ্ছো মা, বাড়ি এসো।

'বাড়িই তো যাচ্ছি মা'—বলিয়া আগাইয়া গিয়া শঙ্করী শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

'পার্ব্বতী ঠাকুর—'মা, মা,—'মা আমার' বলিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় শঙ্করীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সিক্ত নেত্রে শঙ্করী নরু ও অপর্ণার হাত ধরিয়া শ্বশুর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিজয়ার দিন বৈকালে শঙ্করী অপর্ণার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। নরেশ পাশে বসিয়া প্রতিমা নিরঞ্জন দেখিতে নদীর ধারে যাইবার জন্য তাহার বউদিদিকে জেদ করিতেছিল।

সুরেশ চন্দ্র বাড়ি ফিরিল।

'দাদা এসেছেরে,'—বলিয়া নরেশ লাফাইয়া উঠিল। চুল আধ বাঁধা অবস্থাতেই ছুটিয়া গিয়া অপর্ণা দাদাকে জড়াইয়া ধরিল। মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া শঙ্করী সরিয়া বসিল।

সুরেশচন্দ্র শঙ্করীকে ঘরে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সন্ধ্যার পর ভবানন্দ রায় ও পার্ব্বতী ঠাকুর বিজয়ার কোলাকুলি করিলেন। আজ আর জয়ের উষ্ণ বাসনার তীক্ষ্ণতা তাঁহাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছে না,—আপন পরাজয়ের গৌরব প্রকাশে উভয়ের চিত্ত উন্মুখ।

রাত্রে শঙ্করী সুরেশচন্দ্রকে প্রণাম করিল।

'আজ তোমার কপালে জয়ের টীকা পরিয়ে দি' শঙ্করী—বলিয়া সুরেশচন্দ্র শঙ্করীর ললাটে বড় করিয়া একটি সিন্দুরের টিপ পরাইয়া দিল।

আমাদের জয়ের টীকা ওখানে থাকে না—

বলিয়া শঙ্করী স্বামীর পায়ে কপাল ঠেকাইয়া সিন্দুরের টীপের ছাপ তাহার পায়ে আঁকিয়া দিল।

উপসংহার

কি দেখ্‌ছো বাণী!

বাণী অবাক হইয়া মনোজের মুখের পানে চাহিয়াছিল। হাসিয়া জবাব দিল,—শাপ দিওনা যেন ভট্টচায্যি মশায়, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম প্রণামটাও ক'রতে।

স্মিতমুখে বাণী স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। মনোজ গুরুর গাম্ভীর্য্যে মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—স্বস্তি!

—আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। কিন্তু, হঠাৎ এ রূপান্তরের কারণ দাসী জিজ্ঞেস ক'রতে পারে কি?

—অধিকারের বাইরে 'দাসী' যেতে চাইলে প্রভুর কর্ত্তব্য তাকে সাবধান করে দেওয়া। কিন্তু পরিহাস এখন থাক,—একটা কথা সত্যি সত্যিই তোমায় জিজ্ঞেস করি বাণী—আমায় এই নূতন বেশে তোমার কেমন লাগে!

—আর এক দফা নিমাই-সন্ন্যাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

—আমার প্রশ্ন তা' নয়। আমি জিজ্ঞেস কর্‌ছি,—তোমার ভাল লাগলো না মন্দ লাগলো।

—কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্? কিন্তু, এ খেয়াল তোমার হঠাৎ চাপলো কেন?

—তোমার এই কেন'র জবাব বর্ত্তমানে না দিয়ে এইটুকু জানিয়ে রাখি,—এ বেশে আমি বড় হাল্‌কা বোধ কর্‌ছি; বড় শান্তি পেয়েছি; স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছি।

—আচ্ছা, আপাতত না হয় এইটুকুই জেনে রাখলাম। কারণটা

বুঝি খুব কড়াকড়ি ভাবেই অপ্রকাশ্য ?

—আবার স্মরণ করিয়ে দিই, প্রভু আমি।

—আচ্ছা, প্রভু-মশায়, 'দাসীর' অধিকারের গণ্ডী কা'ল-টাল স্থির হয়ে বেঁধে দেবে এখন। আপাততঃ একটু সুস্থ হও দিকি। আমি আর তোমায় বিরক্ত করবো না।

বিছানার উপর সেই মাসের একখানা 'আলোড়ন' পড়িয়াছিল। মনোজ আনমনে সেখানার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। একটা ছোট গল্প তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। গল্পটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'আধলেখা'; লেখিকা শ্রীমতী অব্যক্তা দেবী। প্রথম দু'চার ছত্রে চোখ বুলাইতে বুলাইতে তার কৌতূহল জাগিল। মাসিকখানা বাণীর হাতে দিয়া বলিল—পড় ত' বাণী, গল্পটা; শুনি।

—থাক্ না,—ও আর এক সময় পড়লেই হবে; এখনই কেন? সারাদিন ধ'রে এসেছ গাড়ীতে, মুখচোখ গিয়েছে ব'সে। এখন একটু ঘুমোও, এখন আর গল্প পড়ে না।

—না, না বাণী, ঘুম আমার পাচ্ছে না; তুমি পড়।

মনোজ শুইয়া পড়িল। বাণী পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে লাগিল।

"আচ্ছা, সুন্দর হওয়া কি বিধাতার অভিশাপ? সৌন্দর্য্য কি পাপ? রঙ্‌টা একটু ফর্‌সা,—ভাসাভাসা টল্‌ট'লে দুটো চোখ; গাল-দুটো একটু ভরাট, একটু গোলাপী; জামা কাপড়টা একটু গুছাইয়া পরা। আর কি রক্ষা আছে! হাজারখানেক লুব্ধ চক্ষু গরল ঢালিতেছে তাহার উপর। পথে ঘাটে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। নিঃসঙ্কোচে পায়না সে নিশ্বাস ফেলিতে। উপহার, লিপিকা, অযাচিত উপকার,—দম বন্ধ হইয়া আসে তার।

এ ত গেল নারীর বেলা। পুরুষের ঘাড়েও এমন দুর্ভোগ আসে।

আমি জলজ্যান্ত পুরুষ ; যুবক, কলেজের পোড়ো। আমার মুখখানায় নাকি এমন কি একটা আছে, যা দর্শকের চোখে মোহের প্রলেপ মাখাইয়া দেয়। আবার মণির সঙ্গে কাঞ্চন সংযোগ,—সবগুলো পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ ক্লাসে পড়িতেছি। সুতরাং বান্ধববান্ধবী মহলে আমার দরটা বেশ একটু চড়া বৈকি !

অবস্থা ভাল নয়। পাড়াগাঁয়ে বাস। চাষবাসের উপরই নির্ভর। পড়ার সব খরচ জোগানো কষ্টকর। টুইশানি করিতেছি। বড় বড় ঘরেই টুইশানি জুটিয়াছিল ; কিন্তু একটু হিসাব করিয়াই এইটা গ্রহণ করিয়াছিলাম। গল্প উপন্যাসের ভাগ্যবান প্রেমিক নায়কের মত যোড়শী শ্রীমতী অমুকীকে টুইশানি করি নাই ; কিম্বা শ্রীমান অমুককে পড়াইতেছি না, যার অতি নিকট আত্মীয়া কোন শ্রীমতী বেথুন বা ডায়োসেশনের ছাত্রী। তেমন জুটে নাই, তাহা নয় ; নিজের দিক দেখিয়া অতি সতর্কতার সঙ্গেই আমি সেগুলিকে পরিহার করিয়াছিলাম। পড়াইতেছি একটি ছেলেকে, বাড়িতে তার বাপ, ঠাকুর আর চাকর। নিতান্ত নিরামিষ সংসার। সুতরাং এখানে খপ্ করিয়া প্রেমে পড়িয়া, একটা রোমান্স তৈরী করার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই এইখানে ঢুকিয়াছি। তা ছাড়া বলিতে লজ্জা নাই, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পরই, বিধবা মার একমাত্র আকাজ্ঞা—আমার উদ্বাহ কর্ম্ম—মা সম্পাদন করিয়াছিলেন,—কোন্ দিন চলিয়া যাইতে হইবে বিবাহটা না দেখিয়া, এই অজুহাতে। আর আর পাঁচজনের মতই আমিও বিবাহে যুগপ্রচলিত একটা অসম্মতি দিতে ছাড়ি নাই কিন্তু তবুও বিবাহ আমার হইয়াছে। বান্ধব বান্ধবীদের নাসিকা কুঞ্চন ও সমালোচনার তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হইলেও—রোমাঞ্চবিহীন

গ্রাম্য জীবনে ঢুকিতে হইলেও 'ছক্কর গাড়ী'র ঘোড়া আমায় হইতে হইয়াছে,—আজ এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইতেছে। তাতে আমার লাভ হইয়াছে, কি লোকসান হইয়াছে, সে হিসাব আজ করিব না। বলিয়া রাখি, আমার এই নূতন আত্মীয়াটি আমার মনোমত পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আদব-কায়দার, ধোপ-দোরস্ত না হইলেও পৈতৃকতার উত্তরাধিকারিত্ব হিসাবে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কিছু দখল পাইয়াছে।

পাশেই কুমারী ইভাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। জমাট আলাপ না থাকিলেও একটু পরিচয় আছে উভয়ের সঙ্গে উভয়েরই। পরিচয়ের কারণও কিছু ছিল। বি-এ পরীক্ষায় আমার পরেই স্থান ছিল ইভার। এই সূত্রেই একটু জানাশুনো হইয়াছিল।

আমি বড় একটা মেলামেশা কাহারো সঙ্গে করিতাম না, করিতে জানিতামও না। পাড়াগেঁয়ে লাজুক হইলে যা' হইয়া থাকে। তার উপর নিজের পড়াশুনা, ছাত্রের অধ্যাপনা, এই লইয়াই সবটা সময় কাটিয়া যাইত। তা'ছাড়া, কলিকাতার মত জায়গার সুশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে মিশিতে যে সব বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন তা আমার ছিল না; আদব কায়দাতেও বিশেষ ওয়াকিবহাল না থাকায় আমার রীতিমত ভয় করিত মিশিতে।

প্রতি পূর্ণিমাতে বসিত ইভাদের বাড়িতে 'শ্যামসঙ্ঘের' সম্মেলনী। বিশিষ্ট তরুণী ও তরুণদের সমাগম হইত সেই সম্মেলনে। কত যুগোচিত প্রসঙ্গের অবতারণা, আলোচনা, সমালোচনা ও সমাধান হইত সেখানে।

আমার থাকিবার ঘর হইতে শুনিতাম তাহাদের গান, হাসি, আলোচনা, তর্ক। একটা উন্মাদনাময় আনন্দ হিল্লোল। যৌবনের এ

মহোৎসব কমঠপন্থী আমার চোখে প্রথমটা একটু বিসদৃশ ঠেকিলেও ক্রমেই অরুচিটা কাটিয়া গেল। শেষে নিজেকেই বঞ্চিত মনে করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক পূর্ণিমা সম্মেলনে আমার প্রথম আমন্ত্রণ আসিল 'বেয়ারা'-বাহিত এক সুদৃশ্য সুরভি কার্ডে। গৌরব বোধ করিলাম। 'খসড়া করিতে বসিয়া গেলাম। কেমন ভঙ্গীতে গিয়া নমস্কার করিব, কতটুকু সপ্রতিভতা দেখাইব, সব সময়েই মুখে সস্তা হাসি লাগাইয়া রাখিব—না,—একটু গম্ভীর, ভারিক্কি হইব! কি প্রকার আলোচনা হইলে কোন্ দিকে যোগ দিব, অথবা কোন কিছুতে যোগই দিব না!

সারা দিনটাই কাটিয়া গেল খসড়া করিতে, পাকা আর হইল না। কিন্তু, গলদ যে রহিয়াছে গোড়ায়। যে সজ্জায় আমায় সম্মেলনে যাইতে হইবে তার চেয়ে ইভাদের বয়টারও পোষাক ভাল যে! টাকা কড়ি থাকিলে না হয় ওদের রুচি মাফিক একটা কিনিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু,—

এমন দুঃখ হইতে লাগিল! যা' হোক, কোন রকমে গুছিয়ে গাছিয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম ত সম্মেলনে।

যাইতেই ইভা স্বয়ং আসিল প্রত্যুদ্গমন করিতে। কৃতার্থ হইলাম। সমাগত তরুণ তরুণীদের মধ্যে অপরিচিতের সংখ্যাই বেশী; দু'একজন মাত্র অর্দ্ধ-পরিচিত। প্রত্যেকেরই সজ্জায় ও ভঙ্গিমায় একটা বিশিষ্টতা সুপরিস্ফুট। গৃহসজ্জা ও আসবাব দেখিয়া মনে হইল,—সুন্দর মনের সুরুচি মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে!

আসিয়া ভাল করি নাই। আমার দীন সজ্জাটাই বোধহয় সুমার্জ্জিত তরুণদের মনে একটা সঘৃণ বিরক্তি আনিয়া দিল। তাহাদের অবাধ আনন্দ স্রোতে আমি একটা অপ্রীতিকর' বাধা হইয়া দাঁড়াইলাম।

তাহাদের উৎসব-সরস চিত্তে আমি আজ একটা দারুণ অস্বস্তি। তরুণীদের চোখে কিন্তু কোমল কারুণ্য ছাড়া বিশেষ কিছু দেখিলাম না।

ইভা সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিল। আমি কিন্তু জামার ভিতর ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। কি জানি কেন বার বার মনে হইতেছে, আসিয়া ভুল করিয়াছি।

আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে তরুণ বান্ধবদের মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠায় সেদিনকার সম্মিলনটাই ব্যর্থ হইয়া গেল, বলা যায়।

ফিরিতে রাত্রি একটা হইয়া গেল। বাকী রাত্রিটুকু ঘুম হইল না, এ কথাটা না বলিলেও কাহারো বুঝিতে দেরী হইবে না। আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থা কোন মনস্তত্ত্ববিদের হাতে পড়িলে তিনি তাহা লইয়া নানান্ কসরৎ দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু তখন মনের দিকে তাকাইবার না ছিল আমার সামর্থ্য—না ছিল প্রবৃত্তি। একটা প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আমি তখন একান্ত নিষ্ক্রিয়।

আর শুধু পূর্ণিমা সম্মেলনে নয়, কারণে অকারণে, দিনে দশবার না হইলেও,—এক আধবার অন্ততঃ নিমন্ত্রণ আসে ইভার কাছ হইতে। আমিও নানান্ অজুহাতে ইভাদের বাড়ীতে যাই। অনেকগুলি বান্ধবীর সঙ্গে সেখানে এই সূত্রেই আমার ঘনিষ্ঠতা। ভগবান আমার কণ্ঠে সুর দিতে কৃপণতা করেন নাই। আমার সঙ্গীত নাকি বড় ভাল লাগে তাহাদের। তাহারা নিজে গান করে না, শুধু আমার গান শোনে,—মুগ্ধ,—পুলকিত ; চোখে তাহাদের সপ্রশংস দৃষ্টি, মুখে তৃপ্তির কমনীয়তা !

গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলাম। কে-ই বা না হয়। গান শুনাইয়া পাগল করার অধিকার আজকালকার দিনে পুরুষের কই ?

এখন আমার সজ্জাদিতে আর গ্রাম্যতা নাই। কালোপযোগী

রুচিসম্মত প্রসাধন লইয়া আমি দিনে অন্ততঃ তিনটি ঘণ্টা রীতিমত ব্যস্ত। পুরুষ হইলেও আমার রূপের কদর ছিল; 'গুণে'ও লোকের চোখে খুব খাটো ছিলাম না। সুকণ্ঠ;—তার উপর সুবেশ। সবগুলি মিলিয়া আমাকে বান্ধবী মহলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিল।

ক্রমে দেখি, আমি বান্ধবীদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়া দিয়াছি। আর সেই সঙ্গে বান্ধববর্গকে আমার শত্রু করিয়া তুলিয়াছি।

নবীন উৎসাহ আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আজ টি পার্টি, কাল গার্ডেন পার্টি, পরশু য়্যাট্ হোম্ এন্টারটেনমেন্ট, আমায় এক নূতন জীবনের সন্ধান দিল। মমতাময়ী স্ত্রী,—পরীক্ষার পড়া, সব পড়িয়া রহিল অনাদৃত ভাবে। আমি তলাইয়া গেলাম—হারাইয়া গেলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমিতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন আভাদেবী। ইহাদের ঠিক সমবয়সী না হইলেও বেশি বড় হইবেন না। তবে, ইনি বিবাহিতা, এবং হিন্দু সধবার প্রত্যেকটি চিহ্ন ইহার নিকট গৌরবের,—তাঁর সজ্জা এই ভাবটাই সগর্ব্বে ঘোষণা করে। তাঁকে সমীহ করিতাম আমরা সকলেই এবং তাঁর উপস্থিতি, কেন জানিনা, সাবধান ও সংযত করিয়া দিত সকলের ব্যবহারকে। সনাতনী নৈতিকতার দু'চারিটা বুলিও তাঁর মুখ থেকে মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যাইত। সুতরাং, সমীহ করিলেও আমাদের অবাধ আনন্দ মেলায় তাঁর উপস্থিতি খুব বেশি বাঞ্ছনীয় ছিল না।

সেদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবস। আমরা কয়জন বান্ধব বান্ধবী 'যক্ষজয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলাম। বিরহের অভিনয়ে মিলনের আগ্রহ মনে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মনে - মুখে

আশা-আনন্দের একটা আত্মবিস্মরণী তৃপ্তি। জীবনটাকে বাধাহীন বন্ধনহীন একটা প্রেমগীতিকাতে পর্য্যবসিত করিয়া লইয়াছি। মানসিক উন্মাদনা প্রতিপদেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সংযত, শক্ত পদবিক্ষেপে আভাদেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাক গাম্ভীর্য্যে আমাদের আনন্দোন্মাদনার চাপল্য স্তব্ধ হইয়া গেল। তাঁহার দৃষ্টি মনের ভিতর ঢুকিয়া একটা সত্রাস অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া দিল। তাঁহাকে বাদ দিয়াই আমরা এ উৎসব করিতে চাহিয়াছিলাম। তাই, নিমন্ত্রণ পাঠাই নাই। কিন্তু হইয়া গেল উল্টা। তিনি বসিলেন না; আমরাও কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, তাঁহার অতর্কিত আগমনে,—বসিতে বলিতেও ভুলিয়া গেলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আমার উদ্দেশ্যে বলিলেন—একটা কথা আজ আপনাকে না জানিয়ে পারছি না। আপনি অতি অল্প সময়েই বড় বেশি এগিয়ে পড়েছেন। আপনি এখন মোহাবিষ্ট, হয়ত আমার অনুরোধ আপনার কানে ঢুকবে না। তবু বলে যাই, এ আলো নয়, আলেয়া। আরও একটা কথা জানিয়ে যাই—আমার এ দরদেরও কারণ আছে।

জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই আভাদেবী বাহির হইয়া গেলেন।

বাণী চুপ করিল। মনোজের চোখ মুখ তখন উত্তেজনার রঙে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

—থাম্‌লে কেন বাণী, প'ড়ে যাও।

বাণী বলিল—আর নাই, শেষ হয়েছে।

—শেষ হয়েছে? না, কখনো না; এ অবস্থায় কোন গল্প শেষ হ'তে পারে না। ধরো খাতা পেন্সিল, লিখে যাও বাণী, উপসংহার আমি করবো।

উত্তেজনার আতিশয্যে মনোজ উঠিয়া বসিল। বাণী স্বামীর মুখের

দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনোজ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—লেখো বাণী, 'তারপর মাতালের মত শ্লথ পদে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আভাদেবীর তিরস্কারে নিজের উজ্জ্বল অতীত, ভীতিপ্রদ বর্ত্তমান, আর ততোধিক ভীষণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। নরক যন্ত্রণায় বিপর্য্যস্ত মনটার ভিতরে আস্তে আস্তে ভাসিয়া উঠিল, এক মমতাময়ীর বাহ্যাভিব্যক্তিশূন্য অতল অমেয় প্রেমের ঘনবিগ্রহ দুটি সজল কালো চোখ। সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতিটা একটা অব্যক্ত বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। দীনতার কালিমায় মন কালো হইয়া গেল। সারা রাত ছটফট করিয়া কাটিল। মনে হইতে লাগিল,—ছুটিয়া যাই এই নির্দ্দয়া মহানগরীর দূষিত আবহাওয়া ছাড়িয়া, আমার স্নেহময়ী পল্লীর ছায়া শীতল কোলে। আর ঝাঁপাইয়া পড়ি,—আমার অনাদৃতার ক্ষমার-গঙ্গাজলে-চিরপূত বক্ষটির উপর। কিন্তু এই মালিন্যকলুষ মন লইয়া সে দেবীমূর্ত্তির সম্মুখীন হইবার সাহস হইল না। না, না, প্রায়শ্চিত্তের আগুনে খাটি না হইয়া সে দেববিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার যে আমার নাই।

প্রায়শ্চিত্ত;—হাঁ, প্রায়শ্চিত্তই করিতে হইবে। শিক্ষার অনুপম সাফল্য গৌরব—আর সযত্ন প্রসাধিত সৌখীন দেহের পারিপাট্য, এই দুইটাতে মিশিয়া উৎকট তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল আমার দেহ মনে। মনের মধ্যে কোন বিকল্প না আনিয়া এই দুইটাকেই দিলাম বিদায় করিয়া। বইগুলো পুড়াইয়া ফেলিলাম। প্রসাধনের দ্রব্য সম্ভার ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া দূর করিয়া দিলাম। সুপ্রসাধিত চুলগুলিকে মনে হইতেছিল কলঙ্কের কালি। একটা নাপিত ডাকিয়া সেগুলা শেষ করিয়া দিলাম। তারপর এক বস্ত্রে মোহময়ী মহানগরী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বহুস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলাম আপন ঘরে,—অপরাধ-শঙ্কিত চিত্ত,—দীনতার কালিমায় মলিন।'

—লিখছো না, বাণী!

বাণীর চোখদুটি তখন জলে ভরিয়া গিয়াছে। ধরা গলায় উত্তর করিল—হাঁ, লিখ্‌ছি,—তবে কাগজে নয়, অন্যত্র।

বাণীর পিসতুতো বোন কলিকাতা হইতে লিখিয়াছে,—সুদীর্ঘ অদর্শনের পর বাণীর সহিত দেখা করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে একঘেয়ে সহর বাসের বিরক্তির একটা সাময়িক অবসান করিতে দিন কয়েকের জন্য সে আসিতেছে বাণীর বাড়ী।

স্নানান্তে মুণ্ডিতশীর্ষ মনোজ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিতেছে, একখানি ছই-ঘেরা গো গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঠিক এই বেশটাতেই আপনাকে দেখবার আশা না করলেও এমনি একটা পরিবর্ত্তন যে আপনার প্রয়োজন হয়েছিল, সেটা বেশ বুঝেছিলাম,—মনোজ বাবু।

মনোজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার বিস্মিত কণ্ঠস্বর হইতে বাহির হইল,—আপনি! আভাদেবী!

দ্বারে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া বাণী বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

—ইন্দু দি!—

প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই বাণী নবাগতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। মনোজের বিস্ময় বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

—আসুন, মনোজ বাবু, আপনি ত অভ্যর্থনা করবেন না, আপনার বাড়িতে আজ আমিই আপনাকে অভিনন্দিত করছি।

মনোজ বিস্ময় ও লজ্জার মাঝখানে পড়িয়া বিমূঢ় হইয়া এতক্ষণ পরে একটা নমস্কার করিয়া ফেলিল।

বাণী বলিল,—এই যে তোমাদের আলাপ আছে দেখছি। আমি ত' জানি, তুমি ইন্দুদি'কে চেনো না। তুমি-ও ত' বল্‌ছিলে তাই।

জবাব দিল ইন্দু। উনি ঠিকই বলেছেন, বাণী। মাঝে একটা খটকা লেগে রয়েছে, সেটা আগে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। আমি ইন্দু হলেও উনি আমাকে আভা ব'লেই জানেন। এবং আমার সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাও উনি জানেন না। 'আভা' এই ছদ্মনামেই আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয়। আমার এই ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে যে ইতিহাসটুকু আছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি না দিলে তোমাদের ধাঁধা কাটবে না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মনোজের দিকে ইন্দু চাহিল। মনোজের সলজ্জ সম্মতি পাইয়া ইন্দু বলিতে লাগিল—আমার স্বামী মনোজ বাবুদের একজন প্রোফেসর! একদিন তাঁর মনটা অস্বাভাবিক ভারী দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিলেন—বিশেষ কিছু না, একটি পাড়াগাঁয়ের ছেলে,— ছেলে ব'লে ছেলে, 'কোটিকে গুটিক',—মফস্বলের এক কলেজ থেকে বি-এ তে ফাষ্ট হয়ে কলকাতায় এসেছে এম-এ প'ড়তে। একটু ভাবান্তর দেখে তার দিকে আমি লক্ষ্য রাখছিলাম। এখন দেখি সে শ্যামসঙ্ঘে মিশে পড়েছে। আর এই শ্যামসঙ্ঘটির ওপর আমার বেশ ভাল ধারণা নেই।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বল্লাম,—তাতে তোমার এত ভাববার কি রয়েছে!

—ভাববার আছে বই কি! এক ত' ছাত্র। তারপর সন্ধান নিয়ে জেনেছি, ছেলেটি তোমারই এক আত্মীয়; সুতরাং আমারও

পর নহে ; তোমার এক মামাতো বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখন তাকে ফেরাতে না পারলে তার জীবনটা ত নষ্ট হবেই ; তোমার বোনটিরও অশান্তি কম হবে না।

অনেক আলোচনার পর পরামর্শ এঁটে 'আভা' ছদ্মনাম নিয়ে শ্যামসঙ্ঘের সম্পাদিকা ইভার সঙ্গে একদিন আলাপ করি লেকের ধারে। দু'চার দিনই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো। আমি অবশ্য তাকে জান্‌তে দিই নাই যে আমি তাদের প্রফেসরের স্ত্রী। তারপব থেকে আমি লেকের ধারে বেড়াতে যেতে আরম্ভ করলাম এবং মেশামিশির ফলে শ্যামসঙ্ঘে যোগ দেবার আমন্ত্রণও পেতে লাগলাম। শ্যামসঙ্ঘ থেকে ফ্যাক্‌টস্‌ যোগাড় ক'রে কিছু অদল বদল ক'রে, কিছু-টা বা রঙ্‌ ফলিয়ে গল্পের আকারে ব্যাপারটা লিখে রাখতাম। এমনি করে 'আধ-লেখা' গল্পটির রচনা হয়েছে। তারপর মনোজ বাবু কলকাতা ছেড়ে চলে এলে লেখাটা কিছুদিন বন্ধ থাকে। এরই মধ্যে ওটা 'আধ লেখা' নাম দিয়ে আলোড়নে আত্মপ্রকাশ করেছে ; আর লেখিকার নাম হয়েছে অব্যক্তা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্বামী বললেন—আমি জানি মনোজ আলোড়ন খুব পড়ে। এ অবস্থায় গল্পটা তার অনেকটা উপকার করতে পারে ভেবে সম্পাদকের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে ঐ অবস্থাতেই ছাপতে দিয়েছিলাম।

বাণী বলিল,—আর, বুঝি আজ তোমার এখানে আসা,—তোমার গল্পের উপসংহার সংগ্রহ করতে !

ইন্দু বলিল—না বাণী, গল্পের জন্য আমার এতটুকু দরদ বা উৎসাহ নেই। তোরই জন্য এত বড় একটা দুঃসাহসিক ব্যাপারে আমি নেমেছিলাম। আজ তাই দেখতে এলাম, আমার শ্রম ভগবান কতখানি সার্থক করেছেন !

—সার্থক করেছেন ইন্দু দি! তোমার ‘আধ লেখার’ যোগ্য উপসংহার উনি নিজেই করেছেন। ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ভরসা পঙ্গু করেছেন, তোমার গল্পের উপসংহার করতে; আর ওঁর এই ব্যর্থতার মধ্যেই ওঁকে ফিরিয়ে পেয়েছি। এমন ব্যর্থতা সার্থকতার চেয়ে ঢের বেশী মূল্য বহন করে। আর, তোমার ঋণ,—বাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সাব্যস্ত হইয়া বলিল—গল্পটাকে আর ‘আধলেখা’ না রেখে সম্পূর্ণ ক’রে দিও। বাকীটা আমি তোমায় দেবো, আমারই ভাষায়। একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে আলোড়ন সম্পাদককে ছাপতে বলো।

বলিয়া বাণী ইন্দুকে হাতে ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। মনোজ সলজ্জ হর্ষে তাহাদের অনুসরণ করিল।